বাংলার মনীষী

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্‌, এ-প্রণীত



প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
ঢাকা

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
ঢাকা

ঢাকা—নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেস শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত। ১৩৩৮

বাংলার মনীষী

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্‌, এ-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী

বীরত্বে বাঙালী

বিজ্ঞানে বাঙালী

বাংলার মনীষী

বাংলার ঋষি

আচার্য্য জগদীশ—জীবনী ও আবিষ্কার

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বাণী

রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা

কেনারাম

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলার যে সকল মনস্বী জ্ঞানের দীপ্তোজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে জগৎ-সভায় অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবনকথা 'বাংলার মনীষী'তে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থখানি বঙ্গ-গৌরব-গ্রন্থমালার অন্তর্গত। এই গ্রন্থমালায় বাংলার প্রতিভাবান্ কর্ম্মী ও কৃতী পুরুষগণের কর্ম্মক্ষেত্রভেদে বীর, ব্যায়ামবীর, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, ধর্ম্মগুরু, রাষ্ট্রনায়ক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ-ক্রমে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত চরিতাখ্যান অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। যে সকল মনস্বী প্রধানতঃ শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞানানুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন অথচ ঠিক পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন গোষ্ঠীর অন্তর্গত নহেন, তাঁহাদিগকে এই 'মনীষী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এ কয়েকটী নামেই এই গোষ্ঠীও পরিসমাপ্ত হয় না। প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগৃহীত হইলে গ্রন্থখানি আরো সমৃদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইব।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত প্রভাত সান্যাল। ইঁহাদের প্রবন্ধাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। 'অধ্যাপক যদুনাথ সরকার' শ্রীযুক্ত প্রভাত সান্যাল মহাশয়ের লিখিত; স্বল্পায়তন বলিয়া উহা সমগ্রই গ্রহণ করিয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

বইখানি বাঙালী ছেলেমেয়েদের জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহার উন্মেষে ও পরিবর্দ্ধনে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিলে আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

আশ্বিন
১৩৩৮

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ



শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দ

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী মূর্ত্তি তুমি'। —রবীন্দ্রনাথ

অরবিন্দ শুধু দেশপ্রাণ, 'দেশবন্ধু' নহেন, তিনি মনীষী, তিনি সত্যদ্রষ্টা, তাই তিনি ঋষি। অসাধারণ তাঁহার প্রতিভা ও মনীষা। পৃথিবীতে এত বড় পণ্ডিত বিরল। কিন্তু মনীষার সঙ্গে সত্যদর্শনের মিলন সর্ব্বত্র দেখা যায় না। অরবিন্দে তাহাই ঘটিয়াছে। অরবিন্দ সত্যদ্রষ্টা মনীষী। অরবিন্দ তাঁহাদেরই একজন যাঁহারা বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

সত্যদ্রষ্টা মনীষী

১৮৭২ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা সহরে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণধন ঘোষ কলিকাতার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। অরবিন্দের মাতা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু সেকালের একজন প্রধান লোক ছিলেন। তখন বাংলায়

একটা ভাঙা-গড়া চলিতেছে। সমগ্র জাতি একটা আবর্ত্তের মধ্য দিয়া যাইতেছে। সেই সময়ে রাজনারায়ণ জাতি গঠনে স্থপতির কাজ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, স্বদেশ—সব-কিছুর উন্নতির জন্য তিনি আমরণ খাটিয়া গিয়াছেন। সত্যই তিনি ছিলেন 'জাতীয়তার পিতামহ।' সে-যুগে এমন স্বাদেশিকতা খুব কম লোকেই দেখা গিয়াছে। বাঙালীকে সবদিক্ দিয়া বড় ও মহৎ করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প। ভারতীয় আদর্শ ও সভ্যতা তাঁহার চোখে অপরূপ মহিমা-মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছিল। অরবিন্দের স্বদেশ-প্রেম এই বৃদ্ধ মনীষীর অবদান।

পিতা ও মাতামহ

ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ সাধারণ্যে ডাঃ কে ডি ঘোষ নামে সুপরিচিত ছিলেন। সহরে তাঁহার পশার-প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট। তবু ডাক্তারিবিদ্যায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভের জন্য তিনি এই প্রাপ্ত বয়সে বিলাত গমন করিলেন। সেখানে আই-এম্-এস্ প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। বিলাতে থাকিতেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহ তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি পূরাদস্তুর সাহেব। এই পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি তাঁহার বাকী জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে। তিনি ছেলেপিলেদিগকে সাহেবী শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। দার্জ্জিলিং সেণ্টপল্‌স স্কুলে অতি অল্পে বয়সেই অরবিন্দকে ভর্ত্তি করিয়া

বাল্যশিক্ষা

দিলেন। এই স্কুলে অরবিন্দকে য়ুরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বালকদের সঙ্গে একত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইত। তাঁহার পিতার ইচ্ছা, বিদেশী আবহাওয়ায় থাকিয়া ছেলেও য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ হইতে পারিবে।

দার্জ্জিলিংএ অরবিন্দ দুই বছর অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তাঁহার পিতা ছেলেদিগকে লইয়া বিলাত গমন করেন। সঙ্গে অরবিন্দের মাতাও গিয়াছিলেন। তখন অরবিন্দের বয়স মাত্র সাত বছর। এই সময়ে ইংলণ্ডেই অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়।

বিলাতে শিক্ষা

অরবিন্দেরা চারি ভাই। তাঁহার বড় দুই ভাই। তন্মধ্যে স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি খুব বিদ্বান্ লোক ছিলেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

অরবিন্দ কিছুকাল ম্যাঞ্চেস্টারে পড়েন। তারপর লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বিলাতে থাকিতে অরবিন্দের জীবন বড় স্বচ্ছল অবস্থায় কাটে নাই। ডাঃ কৃষ্ণধন যদিও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু তাঁহার বদান্যতা ও সাংসারিক অনভিজ্ঞতার জন্য অনেক সময় অত্যন্ত অভাবে পড়িতে হইত। অরবিন্দ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি যে বৃত্তি পাইতেন তাহাতে তাঁহার অনেক কষ্টের লাঘব হইত। উহাতেই তাঁহার নিজের খরচ চলিয়া যাইত।

১৮৯০ সালে অরবিন্দ আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বছর। এই পরীক্ষায় তিনি সমস্ত বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহণে অপটু বলিয়া তিনি আই-সি-এস্ হইতে পারিলেন না। এই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা নাকি ঘটিয়াছিল। অরবিন্দ যেই মাত্র ঘোড়ায় চড়িতে ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি কি যে হইল, অরবিন্দ এক পা-ও নড়িতে পারিলেন না। কে যেন তাঁহাকে অজ্ঞাতভাবে আটকাইয়া রাখিল। ইহাতে বিধাতার কি ইঙ্গিত আছে কে জানে? আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অরবিন্দের জীবন সম্পূর্ণ পৃথক পথে অতিবাহিত হইত। তিনি সরকারের একজন বড় কর্ম্মচারী হইতে পারিতেন, কিন্তু মুক্তি-মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি অরবিন্দকে হয়ত দেশ পাইত না।

আই-সি-এস্ পরীক্ষা

আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অরবিন্দের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছিলেন একজন ইংরেজ যুবক। তাঁহার নাম মিঃ বিচক্রফ্ট। গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বিচক্রফ্ট দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অরবিন্দ যখন রাজদ্রোহ অভিযোগে অভিযুক্ত সেই সময়ে এই বিচক্রফ্ট সাহেব তাঁহার বিচার করিয়াছিলেন। অদৃষ্টের কি পরিহাস! এককালে যাঁহারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে বসিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই একজন বিচারক, অপর জন তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান শৃঙ্খলিত আসামী।

অরবিন্দ ও বিচক্রফ্ট

আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দ কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে বৃত্তিধারী ছাত্র রূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

অধ্যয়ন সমাপ্ত

এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই অরবিন্দকে সম্পূর্ণরূপে কলেজের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া পড়াশুনা চালাইতে হইত। ১৮৯২ সালে তিনি ক্লাসিক্সের ট্রাইপোসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইল। সৌভাগ্য ক্রমে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে বরোদার গাইকোয়ার ইংলণ্ডে

বরোদার কর্ম্মগ্রহণ

বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার একজন কনফিডেন্সিয়্যাল সেক্রেটারীর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। অরবিন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত পদপ্রার্থী হইলেন। বরোদা-রাজ অনতিবিলম্বে তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। তারপর ১৮৯৫ সালে বরোদা-রাজের সঙ্গে অরবিন্দ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বছর।

অরবিন্দ চৌদ্দ বছর বিলাতে ছিলেন। তাঁহার এই সময়কার জীবনের কথায় বড় একটা জানিবার নাই। যখন তিনি বরোদায় আসিলেন, তখন তিনি একজন রীতিমত সাহেব।

বাহিরে সাহেবীয়ানা

তাঁহার বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন কোন কিছুতেই একজন ইংরেজ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করা যাইত না। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাঁহার জীবনে বাল্যকাল হইতেই আসন লাভ করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ইতিহাসের জ্ঞানধারা তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে অত-বড় পণ্ডিত কমই দেখা যায়।

বাহিরে অরবিন্দ সম্পূর্ণ সাহেব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভিতরটি ছিল খাঁটি ভারতীয় আদর্শে ভরপূর। বরোদায় আসিয়া তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য হইল ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র সব-কিছুকে আপনার করিয়া লইয়া একান্ত অধিগত করা। তিনি বার বছর বরোদায় ছিলেন। এই বার বছর তাঁহার জীবনের একটা মাহেন্দ্র যুগ বলিতে হইবে। এই দীর্ঘকাল তিনি একান্ত মনে নিজের জীবন-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং কালক্রমে স্বদেশের জ্ঞানগৌরব ও তপস্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যে স্বদেশসেবায় নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত উপকরণ এই সময়ে নিজের জীবনে তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিতেছিলেন। এইজন্যই অরবিন্দের বরোদায় অবস্থিতি তাঁহার জীবনের একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ।

অন্তরে অন্তরে খাঁটি ভারতীয়

বরোদায় রাজসরকারে নানাবিভাগে কাজ করিয়া অবশেষে তিনি বরোদা কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল পদ লাভ করেন। মাসিক ৭০০৲ টাকা বেতনে তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজের ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। অরবিন্দের গভীর ও বিশাল চোখ দুইটিতে কী যে মায়া ছিল, উহা সকলকেই আকর্ষণ করিত। বোম্বাই প্রদেশের ছাত্র-সমাজের উপর অরবিন্দের

বরোদা কলেজে ভাইস্-প্রিন্সিপাল

যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বরোদা-রাজ অরবিন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

এখানে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব বড় বিশেষ কেহ ছিল না। অরবিন্দ চিরদিনই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। নীরবে তাঁহার আত্ম-সাধনা চলিতেছিল। বেদ, উপনিষদ, ষড়্দর্শন, গীতা, পুরাণ সমস্ত তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতেছিলেন।

জননী—যোগে দীক্ষা

অরবিন্দ শুধু পাণ্ডিত্যাভিলাষী ছিলেন না। উচ্চতম সত্যসমূহ জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে 'লেলে' নামক এক মহারাষ্ট্র যোগীর সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। লেলের নিকট তিনি যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন।

বাঙালী হইলেও অরবিন্দ বাংলা জানিতেন অতি সামান্যই। বরোদা থাকিতে তিনি বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন।

বাংলা শিক্ষা

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁহাকে বাংলা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

১৯০৫ সাল। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। যৌবনের প্রথম আবেগের মত দেশপ্রেমের প্রথম অভ্যুত্থানে জাতির প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নির্য্যাতিতের ক্ষুব্ধ চিত্ত কোটি কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। বড়লাট তখন লর্ড কার্জ্জন। তিনি আদেশ করিয়াছেন, বাংলাকে দুই টুকরা করিয়া ফেলিবেন—বাঙালীকে বিভক্ত করিবেন। এই অন্যায় আদেশের

বাংলায় স্বদেশী ব্রত

বিরুদ্ধে বাঙালী প্রতিবাদ জানাইল। পূর্ব্ববঙ্গবাসী ও পশ্চিম বঙ্গবাসী, ভাই ও বোন সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধ পবিত্র মনে একত্র মিলিত হইল, পরস্পরের হাতে রাখী পড়াইয়া দিল। কবি স্বস্তি বচন আবৃত্তি করিলেন—

"বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন্
এক হউক, এক হউক
এক হউক, হে ভগবান্।"

সেদিন কাহারো ঘরে আগুণ জ্বলিল না—সেদিন অরন্ধন। সকলেই উপবাসী থাকিয়া মাতৃব্রতে দীক্ষা লইল। ৩০শে আশ্বিন আজও আসে যায়—কিন্তু সেদিন যে প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তেমন আর কেহ দেখে নাই। অক্ষম দুর্ব্বল নিরস্ত্র বাঙালী সেদিন এমনি করিয়াই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছিল—স্বদেশের পায়ে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিল।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া বাঙালী রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। হাতে তাহার হাতিয়ার বয়কট ও স্বদেশী। ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি পাপ বলিয়া বাঙালী দূরে ঠেলিয়া দিল, মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লইল।

বাংলায় যখন এমনি স্বদেশ-প্রেমের বন্যা ছুটিয়াছে, তখন অরবিন্দ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য তিনি এতদিন উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় নিজেকে তৈরী করিতেছিলেন। তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবার জন্য

বাংলায় অরবিন্দ—
জাতীয়যজ্ঞে পৌরোহিত্য

উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা জুড়িয়া যখন স্বদেশ-প্রেমের ঢেউ উঠিল, অরবিন্দ বুঝিলেন, এই ঝঞ্ঝার বেশেই ভগবান্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। সেই আদেশ মাথায় করিয়া তিনি সেই ঝড়ের মুখে পাকা মাঝির মত বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে হাল ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

১৯০৬ সালের জুলাই মাসে তিনি বরোদার সম্মানীয় পদ ত্যাগ করিয়া বাংলায় চলিয়া আসিলেন, ফকিরের বেশে স্বদেশ-সেবার কাণ্ডারী সাজিলেন। এতদিন পরে অরবিন্দের আকৈশোরের সঙ্কল্প রূপ পাইল।

অরবিন্দের এই স্বদেশ-সেবার আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান্ এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

দেশপ্রেম তাঁহার মজ্জাগত

বাংলার স্বদেশ-প্রেমিকগণ দেশকে মাতৃমূর্ত্তিতে পূজা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃমূর্ত্তির বন্দনা-গীতি গাহিয়াছিলেন—

'বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং
মলয়জশীতলাং মাতরম্।'

অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ এই রূপকে জাতির সাম্‌নে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশকে অরবিন্দ কি চোখে দেখিতেন, তাহা নিজেই লিখিয়াছেন—"অন্যলোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ এক মাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

স্বদেশ মাতৃমূর্ত্তি

দেশোদ্ধার কার্য্য তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। দেশের সেবা তাঁহার নিকট পুণ্য ও পবিত্র কার্য্য, ধর্ম্ম্য কার্য্য ছিল। পরম নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি এই কার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই সকল পরম গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব বুঝে না, তাহাদের কথায় তিনি লিখিয়াছেন—

দেশ-সেবার উচ্চ আদর্শ

"বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর ভাবে শুনিতে পারে না; ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়।"

দেশ-সেবার এই উচ্চ ও মহান্ আদর্শ অরবিন্দই এদেশে

সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। এই ভাব লইয়াই তিনি দেশ-সেবার কার্য্যে অবতরণ করেন।

বাংলা দেশে এই সময়ে স্কুল-কলেজগুলির উপর গবর্ণমেণ্টের রোষ-দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সার্কুলারের পর সার্কুলার জারি করিয়া ছেলেরা যাহাতে কোন রাজনৈতিক শোভা যাত্রা ও সভাসমিতিতে যোগদান না করে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে বহু ছেলেকে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে হইল। দেশে তীব্র অশান্তি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। এই সময়ে কলিকাতায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার অধীনে দুইটি ন্যাশনাল কলেজ খোলা হইল—একটি কলিকাতায় ও অন্যটি রংপুরে। অরবিন্দ বাংলায় আসিয়াই কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করিলেন। বাঙালী নত মস্তকে অরবিন্দকে স্বদেশ-যজ্ঞে বরণ করিয়া লইল।

বাংলার জাতীয় শিক্ষা

কিন্তু শীঘ্রই জাতীয়-শিক্ষা-সংসদের সঙ্গে অরবিন্দের মনো-মালিন্য ঘটিল। এই শিক্ষা-সংসদের পুরাতন-পন্থী সভ্যগণ জাতীয় শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকেই নূতন কাঠামোতে রূপায়িত করিয়া তোলাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। অরবিন্দ এই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"The mere inclusion of the matter of Indian thought and culture in the field of knowledge does not make a

অরবিন্দের মত

system of education Indian, and the instruction given in Bengal National College was only an improved European system, not Indian or National." কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্যের জন্য অরবিন্দ ন্যাশনাল কলেজের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অরবিন্দ উচ্চ ও পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শ অন্তরে পোষণ করিতেন।

ইহার পর অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। এই সূত্রে সমগ্র দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্যামসুন্দর

বন্দেমাতরম্ সম্পাদন

চক্রবর্ত্তী, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থ-সাহায্যে কিছুকাল পূর্ব্বে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাখানি প্রচার করিতেছিলেন। এক্ষণে অরবিন্দের মত সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ লোক পাইয়া, উহার পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। এই জন্য একটি যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অরবিন্দ উহার একজন ডিরেক্টর হইয়া পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। অরবিন্দের হাতে পড়িয়া, 'বন্দে মাতরম্' যেন একদিনে বাঙালীর হৃদয়াসন জুড়িয়া বসিল। অরবিন্দের ভাষা যেমন ওজস্বিনী, তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি ভাবময়। স্বদেশ-হিতৈষণার কী সে আবেগ—কী সে উচ্চ ও গভীর ভাব। অরবিন্দের লেখনী-প্রভাবে বাংলায় এক নব প্রেরণা সঞ্চারিত হইল। বাঙালী এক নূতন জাতি হইয়া

দাঁড়াইল। 'বন্দে মাতরম্' দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল। উহা সমগ্র ভারতে পঠিত হইত। এই সময়ে কংগ্রেসে মডারেট বা নরম পন্থীদের আধিপত্য। অরবিন্দের লেখনীর ফলে কংগ্রেসে জাতীয় দল সুগঠিত ও পরিপুষ্ট হইল।

কংগ্রেসে জাতীয় দল

১৯০৭ সালে মেদিনীপুর জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে অরবিন্দ জাতীয় দলের নেতৃরূপে যোগদান করিলেন। এই খানেই সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ্য ভাবে মডারেটদের সঙ্গে জাতীয়দলের বিরোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তারপর ঐ সালেই সুরাট কংগ্রেসে এই দুই দলের মধ্যে রীতিমত ঝগড়া হইয়া গেল। সুরাট কংগ্রেসের পর অরবিন্দ বোম্বে ও মধ্য প্রদেশে বক্তৃতা দিয়া বাংলায় আসিলেন।

গ্রেপ্তার ও আলিপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলা

ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ আলিপুরের ষড়্‌যন্ত্র মামলা। ১৯০৮ সালের ৩০ শে মে গভীর রাত্রিতে অরবিন্দের কলিকাতার গৃহে পুলিশ কর্ম্মচারীরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ অরবিন্দকে হাতে কড়া ও কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া পুলিশ আফিসে নিয়া গেল।

অরবিন্দ ও দেশবন্ধু

এই মামলায় সর্ব্বশুদ্ধ অরবিন্দ প্রমুখ ঊনচল্লিশ জন আসামী ছিলেন। একবছর ধরিয়া এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বাগ্মিতা, বুদ্ধিমত্তা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয়

হইয়া রহিয়াছে। দেশবন্ধুর বক্তৃতার শেষ কথাগুলি আজও যেন কাণে ঝঙ্কৃত হইতেছে—"Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands."

এই মোকদ্দমা যখন আলিপুর দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছিল, সেই সময়ে বিচারপতি ছিলেন মিঃ বিচক্রফ্‌ট। ইঁহার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

দেশবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যৌক্তিকতায় অবশেষে অরবিন্দ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

অধ্যাত্ম-জীবন

এই দীর্ঘ এক বৎসর কাল অরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবনগঠনে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। জেলখানাই ছিল তাঁহার তপস্যা-ক্ষেত্র। তাঁহার এই তপঃকাহিনী ও ভাগবত অনুভূতির কথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। অনেক পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছিলেন—

ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা

"ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের

মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, একমাসের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি।"

এই সময়ে বন্দী অরবিন্দের বন্দনা-গীতি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—

অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি।
তোমা লাগি' নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ব-বাধা-হীন,—
যার লাগি নর-দেব চির-রাত্রি-দিন
তপোমগ্ন;......
সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছো দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।"

সে দিনও রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বাণীই উদ্গীত করিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছেন।

অরবিন্দের এই জয়গাথা গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন—

"জয় তব জয়
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল ?
মোছ রে, দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ অশ্রু জল।
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে ? বন্ধন-শৃঙ্খল তা'র
চরণ বন্দনা করি, করে নমস্কার
কারাগার ক'রে অভ্যর্থনা।"

অরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলনের যে দার্শনিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উহা জাতির চলতি পথের গতিনির্দ্দেশে সহায়তা করিবে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সত্ত্বগুণ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না; এমন কি সত্ত্বপ্রধান জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মতেজই সত্ত্বগুণের মুখ্য ফল, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের ভিত্তি। আঘাত পাইলে শান্ত ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষত্রতেজের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে ব্রহ্মতেজ টিকিতে পারে না। দেশে যদি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে এক শ' ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সত্ত্বগুণের আতিশয্য নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য।

স্বদেশী আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি—সত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রজঃশক্তির বিকাশ

"ভগবান্ অধুনা ধর্ম্মের পুনরুত্থান করাইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মগণ সত্ত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

দেশে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্ত্বিকের খেলা; এ খেলায় যাহা কিছু উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল তাহা অচিরে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইবে।"

একদিন কংসের কারাগারে ভগবান্, বসুদেব ও দেবকীকে দর্শন দিয়া নয়ন জুড়াইয়াছিলেন, আর সেদিন দুর্ভেদ্য লৌহনিগড়ে বন্দী অরবিন্দকেও দেখা দিয়াছিলেন তাঁহার ঈপ্সিত দেবতা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবদ্দর্শন

এই ভাগবত সান্নিধ্য লাভ করিবার পর হইতেই অরবিন্দের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ইহার পর তাঁহার স্বাদেশিকতায় ধর্ম্মভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখা গিয়াছে। তিনি এই নূতন বাণী প্রচার করিলেন দুইখানি সাপ্তাহিকের ভিতর দিয়া—একখানি ইংরেজী, নাম কর্ম্মযোগিন্; অপর খানি বাংলা, নাম ধর্ম্ম। দেশসেবায় অধ্যাত্ম-চেতনা বাংলার প্রাণে প্রাণে এক নববিদ্যুৎধারা সঞ্চারিত করিয়া দিল। অরবিন্দ যে জাতীয়তার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা বলপ্রদ ও প্রেরণাদায়ক। তিনি লিখিয়াছিলেন—

স্বাদেশিকতায় ধর্ম্মভাব

"Nationalism is a religion that comes from God. Nationalism cannot die, because it is God who is working in Bengal. God cannot be killed, God cannot be sent to gaol."

পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ কংগ্রেসের জাতীয় দলের নেতৃত্বেও করিতেছিলেন। ১৯০৯ সালে হুগলীতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনে তাঁহারই কর্ম্মোৎসাহে জাতীয় দলের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। অরবিন্দের বিরুদ্ধে কেহ কথাটি বলিতে পারে নাই। ইহার পর তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। সেই সময়ে ঝালকাঠীতে বরিশাল জিলা সম্মেলনে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা তাঁহার ভাগবত অনুভূতির পরিচায়ক। সেই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন—

"ভগবানের হাতুড়ির নীচে আমরা লোহার মত। তিনি আমাদিগকে যে আঘাত করেন, সে আঘাত আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য নহে, আমাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য। নিপীড়নের ভিতর দিয়াই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হইব।"

পণ্ডিচেরী গমন

১৯১০ সালে অরবিন্দ সুদূর দক্ষিণ ভারতের ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে চলিয়া গেলেন। ভগবানের ডাক তাঁহার কাণে পৌঁছিয়াছিল। এখনও তিনি সেখানেই তপঃসাধনায় ব্রতী রহিয়াছেন। ৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার কথা কেহ শুনিতে পাইলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে দেশবাসী কিছু জানিতেও পারিল না। পণ্ডি-

অরবিন্দের সাধনাশ্রম

চেরীতে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তপস্যায় মগ্ন আছেন, লোকে শুধু ইহাই জানিতে পারিল। ১৯১৪ সালে য়ুরোপে রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে অরবিন্দের উদাত্ত কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল অমৃতের বাণী। ১৯১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দের বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজী দার্শনিক মাসিক পত্র 'আর্য্য' প্রকাশিত হইল। 'আর্য্যে'র বাণী সারা বিশ্বের বাণী—ভারতের জাতীয়তা অরবিন্দের তপস্যা প্রভাবে বিশ্বের কল্যাণকর

আর্য্য পত্রিকা

রূপে প্রকট হইল। ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের উচ্চতম সত্যসমূহ যাহা সাধনার অভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, অরবিন্দের যৌগিক

সাধনায় উহা নবরূপ লইয়া 'আর্য্যে' প্রকাশিত হইতে লাগিল। অরবিন্দের প্রত্যেকটি লেখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর অনুভূতি একসঙ্গে বিদ্যমান।

ঋগ্বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

ঋগ্বেদ আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় অরবিন্দ যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন কি যুক্তির দিক্ দিয়া কি সাধকের অনুভূতির দিক্ দিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা এক অমূল্য দান। এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পৃথিবীতে বিরল।

দেবজন্ম ও যৌগিক সামঞ্জস্য

তারপর তাঁহার 'দেবজন্ম' (Life Divine) ও 'যৌগিক সামঞ্জস্য' (Synthesis of Yoga) নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে মানব জীবনকে ভাগবত জীবনে পরিণত করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভোগায়তন দেহকে কিরূপে যোগায়তন করিয়া তদ্দ্বারা ভাগবত অনুভূতির চরমে পৌঁছা যায় এবং সেই শুদ্ধ ও শক্তিশালী জীবনকে পৃথিবীর হিতার্থে নিয়োজিত করা যায় তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। অরবিন্দ শুধু ভাবুক বা কল্পনা-বিলাসী নহেন, তিনি নিজের জীবনে প্রত্যেকটি সত্য উপলব্ধি করিয়া জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন।

অরবিন্দের গীতা

অরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যা এক অপূর্ব্ব বস্তু। সাধনা-লব্ধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ইহা পরিচায়ক।

পণ্ডিচেরীতে তপস্যারত অরবিন্দের মুখ হইতে বাংলা ও বাঙালী সম্বন্ধে কয়েকটি গভীর চিন্তাশীল কথা নিঃসৃত হইয়াছিল। উহার গোটাকয়েক কথা উল্লেখ করিতেছি।

"বাংলায় আছে ভক্তি, আছে কর্ম্ম। নূতন সৃষ্টির জন্য তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, তোমরা তার সঙ্গে জ্ঞানকে সংযুক্ত কর। জ্ঞানের সাধনা যদি উপেক্ষা কর, সৃষ্টি যত বৃহৎ বলেই মনে কর না, উহা কোন মতেই স্থায়ী হবে না।

বাংলায় কর্ম্ম ও ভক্তি আছে, জ্ঞান চাই

"পূর্ণ জ্ঞান চাই, নতুবা পতনের খুবই আশঙ্কা আছে। কর্ম্ম ও ভক্তি বাংলার মাটীর গুণ, মানুষের দোষ এক্ষেত্রে কিছু নেই; সেইজন্য মাঝে মাঝে এই দুটোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্ঞানের সাধনা কর্‌তে হবে।

"বাঙালীর বুদ্ধি আছে—কিন্তু উহা জ্ঞান নয়। বুদ্ধি ক্ষিপ্র বটে কিন্তু গভীর নয়, বিরাট নয়। বুদ্ধি শান্ত গভীর বিরাটে পরিণত হলেই জ্ঞানের উদয় হবে। ভক্তি যতই প্রবল হোক্, জ্ঞান প্রদীপ্ত না হলে, ভাবচ্যুতি আস্‌বেই, সেজন্য বাঙালীকে জ্ঞানের দিকেই অধিক ঝোঁক দিতে হইবে।"

"শক্তি সব কর্‌ছে—আমি তার যন্ত্র, এই অনুভূতিই যোগের সবখানি নয়। সাধককে অনুভব কর্‌তে হবে যে, শক্তি সাধকেরই—পুরুষের ইচ্ছায় সাধকই কার্য্য ক'রে চলেছে। শক্তির সঙ্গে সাধকের অঙ্গাঙ্গী পরিচয় হ'লেই জ্ঞানের বিকাশ হবে।"

ধর্ম্ম জিনিষটা অরবিন্দের নিকট জড় নয়, মৃত নয়, আচার অনুষ্ঠান মাত্র নয়। ধর্ম্ম তাঁহার নিকট জীবন্ত, শক্তিপ্রদ। নীতিবাগীশের ধর্ম্ম তাঁহার নয়, তাঁহার ধর্ম্ম সত্য-সুন্দরের। এত বড় জ্ঞানী-পণ্ডিত এত বড় যোগী তপস্বী বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়টি নাই।

অরবিন্দ ও মৃণালিনী

১৩২৫ সালে অরবিন্দের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মৃণালিনী ঘোষ পরলোক গমন করেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি পবিত্র ও মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা 'অরবিন্দের পত্রে' কাহারো অবিদিত নাই। অরবিন্দ কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই মৃণালিনী দেবীকে লিখিয়াছিলেন—

"তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই অসাধারণ।

"যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই দুঃখ অনিবার্য্য, মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আমি সাধারণ বাঙ্গালীর মত পরিবার ব। স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমার ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম, আমার নির্দ্দিষ্ট কাজের সফলতায় তোমার সুখ না ভাবিলে আমার উপায় নাই।"

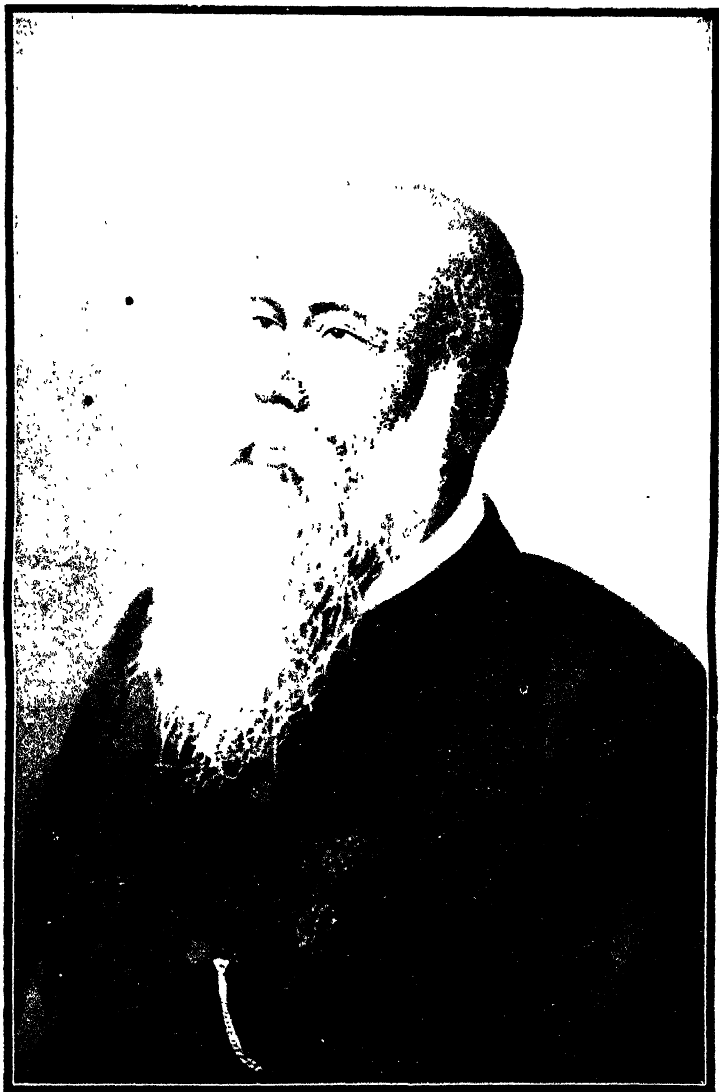
ঐ বীচি-বিক্ষুব্ধ ভারত মহাসাগরের তটদেশে পণ্ডিচেরী—ঐ শ্রীঅরবিন্দের সাধনাশ্রম। তপস্বী অরবিন্দের যৌগিক শক্তি সমগ্র দেশময় বিকীর্ণ হইয়া ভারত জাতিকে সঞ্জীবিত করিতেছে। জাতি বার বার ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছে—অরবিন্দের তপস্যা কি আনিবে না দিন ?

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

এ যুগে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত চিন্তাশীল পণ্ডিত পৃথিবীতে খুবই কম। প্রাচীনেরা এককালে জ্ঞানকে সাগরের সঙ্গে তুলনা দিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সে সময়ে তাঁহাদের চোখের সাম্‌নে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের মত জ্ঞানী-পণ্ডিত দেখা দিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা কোন একজনে বড়-একটা দেখা যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথে তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞানের পরিমাপ করিতে হইলে আমাদেরও অনেকটা উচুঁতে উঠিতে হইবে। আমরা তাহা পারি নাই, কাজেই তাঁহার মহামনস্বিতা হৃদয়ঙ্গম করাও আমাদের পক্ষে সহজ নয়। এইজন্য ব্রজেন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী লোক আমাদের দেশে বিরল। তাঁহার মহোচ্চতা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে জাতিকে আরো দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের মহোচ্চতা

স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল শীল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। সেকালের প্রধান বিচারপতি পিকক্ সাহেব মহেন্দ্রলালকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিতেন।



আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল

ব্যবহার-শাস্ত্র, গণিত ও দর্শনে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। এতদ্ব্যতীত য়ুরোপীয় ভাষার মধ্যে ইংরাজী ছাড়া তিনি ফরাসী, জর্ম্মণ, ইতালীয় ও স্পেনীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল, দার্শনিক অগস্ত কোঁতের ভক্ত ছিলেন। কোঁতের দর্শন-শাস্ত্র তিনি মূল ফরাসী হইতে সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আইন-ব্যবসায়ী হইলেও মহেন্দ্রলাল অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সাত বার বিচার করিয়া দেখিতেন, উহা যথার্থ সম্মানের সহিত পরিচালিত করিতে পারিবেন কিনা। এমনতর লোকের কি পশার হয়, না পয়সা জুটে? মহেন্দ্রলালের তাহাই হইয়াছিল। অর্থ-সম্পদের লালসা তাঁহার মনকে কখনও পীড়িত করে নাই। পার্থিব সুখ-সম্পদ্ তাঁহার জীবনের লক্ষ্যও ছিল না। তাই যখন অপরিণত যৌবনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী-পুত্রদিগকে একান্ত নিঃস্ব ও অসহায় ফেলিয়া যাইতে হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র বত্রিশ বৎসর।

পিতার পাণ্ডিত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা

ব্রজেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রলালের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে ব্রজেন্দ্রনাথ সাত বছরের বালক। পিতৃ-বিয়োগের পরেই বড় ভাইটির সঙ্গে মাতুলালয়ে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মামার অবস্থাও নিতান্ত অস্বচ্ছল ছিল। বড় কষ্টে দুই ভাই মানুষ হইতে লাগিলেন। বাল্যকালের সে দুঃখের কাহিনী করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। মোটা ভাত, মোটা কাপড় ইহাই তাঁহাদের

ভাগ্যে কোনরকমে জুটিত। ছেলে বেলার সখ মিটাইবার উপকরণ তাঁহাদের ছিলনা, পাইতেনও না। দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথের বাল্য জীবন কাটিয়াছিল। দুঃখ মানুষকে সত্যিকার মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। দুঃখের অভিজ্ঞতাই জীবনে পরম সম্পদ্ আনয়ন করে—দুঃখই পরম মিত্ররূপে মানুষকে শ্রেয়ের পথে লইয়া চলে। ব্রজেন্দ্রনাথ বাল্য জীবনে এ শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

বাল্য জীবন দুঃখময়

বাল্যকাল হইতেই ব্রজেন্দ্রনাথ প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। যখন তিনি ইংরেজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়ানো হইত। তখনকার দিনে গ্রীষ্মকালের বন্ধ ছিল মাত্র একমাস। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্ধের পূর্ব্বে বীজ-গণিত মাত্র পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য ছেলেদের বীজগণিতে যে সামান্য জ্ঞান জন্মে, ব্রজেন্দ্রনাথের তাহাই ছিল। তিনি স্থির করিলেন, এবার বন্ধটা ভাল করিয়া কাজে লাগাইবেন। তিনি বীজগণিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একমাস পড়িয়া তিনি বীজগণিতখানি আগাগোড়া আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। একা নিজে তিনি এই বইখানি পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—তাঁহাকে কেহ কোনরূপ সাহায্য করে নাই।

বাল্যজীবনে প্রতিভার পরিচয়

ইহার পর হইতেই ব্রজেন্দ্রনাথ গণিতশাস্ত্রে অত্যন্ত

অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং উচ্চতর গণিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই বছর শেষ না হইতেই তিনি গণিতে এতদূর পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার স্কুলের শিক্ষককেও অনেক দুরূহ প্রশ্নে অনেক সময়ে সাহায্য করিতেন। শিক্ষক মহাশয় সেই বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্রের পক্ষে ইহা অসাধারণ বই কি?

গণিতে অসাধারণ পারদর্শিতা

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত গণিত শাস্ত্রই ব্রজেন্দ্রনাথের অতি-প্রিয় ছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ পাইয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং জেনেরল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হইলেন। এই কলেজের প্রিন্সিপাল এই সময়ে ছিলেন ডাঃ হেষ্টি। হেষ্টি সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ যাহা একবার পড়িতে আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া তবে ছাড়িতেন। এক সময়ে গণিতশাস্ত্র যেমন তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া ফেলিলেন। পাঁচ বছর তিনি কলেজে পড়িয়াছিলেন। এই পাঁচ বছরে তিনি পড়েন নাই এমন বিষয় ছিল না। ইংরেজী সাহিত্য বল, ইতিহাস বল, ব্যবহার-শাস্ত্র বল, দর্শন বল, ভাষাতত্ত্ব বল – সমস্ত কিছুই তাঁহার পড়া হইয়াছিল। তিনি কোন দিন ভাসা-ভাসা জ্ঞান পছন্দ

কলেজে অধ্যয়ন

করিতেন না—যাহা পড়িতেন খুব ভাল করিয়াই পড়িতেন। পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার জীবনে কোন দিনই আশ্রয় পায় নাই। তাঁহার পড়ার গভীরতা ও ব্যাপকতা কতদূর ছিল, তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রজেন্দ্রনাথ যখন ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন সেই সময়ে ইংলণ্ডের প্রাচীনতম সাহিত্য (চসারের পূর্ব্বেকার) এমন কি স্কট্‌লণ্ডের ও ইংলণ্ডের সীমান্ত প্রদেশের দুর্ব্বোধ্য পল্লী-গাথাগুলি পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রগুলি যখন পড়িয়াছেন, তখন প্রাচীন, আধুনিক ও মধ্য যুগের য়ুরোপীয় সমস্ত দর্শন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব পড়িয়া ফেলিয়াছেন। এত যে পড়িয়াছেন, কোন কিছু ভুলেন নাই—অসাধারণ তাঁহার স্মৃতি-শক্তি। প্রত্যেক বিষয়ের খুটিনাটি কথাগুলি পর্য্যন্ত তাঁহার নখদর্পণে রহিয়াছে। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু-দর্শন অধ্যয়ন করিলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে এমন বিদ্যা নাই যাহা ব্রজেন্দ্রনাথের অধিগত নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক সময় বলিয়া থাকেন, প্রাকৃত বিজ্ঞানে ও পদার্থ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান কম। কিন্তু বলিতে কি অনেক বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞকেও ব্রজেন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তায় অবাক্ হইতে হইয়াছে। কোন্ বিষয়ে যে তাঁহার রুচি নাই, তাহা বলা মুস্কিল। তিনি বস্তুতঃই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ। এক ভদ্রলোক একদিন ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে

অধ্যয়নের বিশালতা ও গভীরতা

সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ

গিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ যত রাজ্যের যত ম্যাপ আর চার্ট চারিদিকে ছড়াইয়া লইয়া বসিয়াছেন। শুনিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকার ভূ-প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করিতেছেন।

এ সকল কথা অবিশ্বাস্য নয়, অসম্ভবও নয়। এরূপ প্রতিভা পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথের মনীষা বাস্তবিকই সাধারণের অনেক ঊর্দ্ধে ছিল। কঠিন বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের মাথা খেলিত বেশী। যাহা-কিছু জটিল ও কঠিন, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাতে অসীম আনন্দ পাইতেন। একটি গল্প বলিতেছি। তখন ব্রজেন্দ্রনাথ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন।

একটি গল্প

একদিন ডাঃ হেষ্টির নিকট লজিকের একখানি বই চাহিলেন। বইখানি অত্যন্ত কঠিন। একজন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের এই স্পর্দ্ধায় হেষ্টি সাহেব খুব বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে বেশ একচোট বকিয়া দিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ কিন্তু নাছোড বান্দা, তিনিও বইখানি না লইয়া যাইবেন না, অবশেষে হেষ্টি সাহেব বইখানা দিয়া দিলেন।

তিন চারিদিন পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বইখানা হেষ্টি সাহেবকে ফেরত দিতে গেলেন। হেষ্টি সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "কেমন আমি বলি নাই, তুমি ইহার কিছুই বুঝিবে না ?"

"না স্যর, আমি ইহা বেশ ভাল করিয়াই পড়িয়াছি।"

বালক ব্রজেন্দ্রনাথের এই কথায় হেষ্টি সাহেব অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি উহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ব্রজেন্দ্রনাথের উপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে করিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ সকল প্রশ্নের সুন্দর উত্তর তো দিলেনই, তার উপর বইখানির ভালমন্দের সমালোচনা করিতেও কসুর করিলেন না।

যাহারা ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাহারা জানেন কি গভীর অভিনিবেশ ও নিষ্ঠার সহিত তিনি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। যোগীর মত তিনি অধ্যয়নশীল। যখন তিনি এই তপস্যায় রত থাকেন, পৃথিবীর শত কোলাহল তাঁহার ধ্যান ভাঙিতে পারে না, চিত্ত-বিক্ষেপ করিতে পারে না। সত্যই তিনি জ্ঞানের ধ্যান-গম্ভীর বিরাট হিমগিরি। যখন তিনি কোন বিষয় অধ্যয়ন করেন তখন তাঁহার মনশ্চক্ষে উহার সমস্ত দোষ-গুণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সব-কিছু ভাসিয়া উঠে—এই জন্য মূল গ্রন্থ পড়িলেই তাঁহার জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়, উহার টীকা-ভাষ্যাদির কোন আবশ্যক করে না। এমন তন্ময়তা, তদ্গত-চিত্ততা বড় দেখা যায় না। পড়িবার সময় তাঁহার কোন বাহ্য জ্ঞান থাকে না—আহার নিদ্রা তিনি ভুলিয়া যান। এমন কতদিন গিয়াছে, সন্ধ্যাকালে পড়িতে বসিয়াছেন, যখন পড়া শেষ করিয়া উঠিয়াছেন তখন পরদিন বেলা দুপুর আকাশের মাথায় সূর্য্য তপ্ত রোদ ছড়াইতেছে। আজিকার দিনে এরূপ তপস্বী মিলে কৈ?

অধ্যয়নে অভিনিবেশ ও নিষ্ঠা

জ্ঞানী ও ধ্যানী

ব্রজেন্দ্রনাথ উপযুক্ত পিতার যোগ্যতম পুত্র। পিতার ন্যায় তিনিও বহু-ভাষাবিদ্। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া তিনি ইংরেজী,

ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণ, ইতালীয়, লাটিন, গ্রীক, পারসি, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত! ইহা ছাড়া ভারতের অনেক প্রাদেশিক ভাষাও অবগত আছেন।

বহুভাষা-জ্ঞান

দার্শনিক হইলেও ব্রজেন্দ্রনাথের পরিচালনা-শক্তির প্রাচুর্য্য আছে। কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপালরূপে এবং অবশেষে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলাররূপে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নিকট কেহ কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে পারিত না। নিজেও যেমন নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন, অপরকেও উহার ব্যতিক্রম করিতে দেখিলে তেমনি বিরক্ত হইতেন। কলেজের ছোট খাটো কাজও তিনি নিজ হাতে না করিলে উহা তাঁহার মনঃপূত হইত না। ছেলেদের পরীক্ষার আবেদন-পত্রে কতকগুলি বিষয় কলেজের প্রিন্সিপালকে নিজে লিখিয়া দিবার নিয়ম আছে। অনেক কলেজেই উহা কেরাণীরা লিখিয়া দেন, প্রিন্সিপাল স্বাক্ষর করেন মাত্র। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ স্বহস্তে শত শত আবেদন-পত্রে সমস্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। তারপর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়া উহার উন্নতি-কল্পে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতার পরিচায়ক। কয়েক বছর হইল তিনি মহীশূরের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রিন্সিপাল ও ভাইস্-চ্যান্সেলার

কর্ম্মনিষ্ঠা ও নিয়মনিষ্ঠা

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল যাবৎ বিপত্নীক—যৌবনেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটে। তারপর তাঁহার একমাত্র কন্যা অতি অল্প বয়সেই বিধবা হন। স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বসন্তকুমার দাশের সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। এই উভয় শোকই ব্রজেন্দ্রনাথের চিত্তে গভীর ক্ষত আঁকিয়া দিয়াছিল। তিনি ধীরভাবে এই শোক সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিধবা কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে কৃতী।

পারিবারিক জীবন

১৯২১ সালে লণ্ডনে বিশ্ব জাতি-সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে আচার্য্য শীল আহুত হইয়াছিলেন। তিনি সেই সভায় যোগদান করিয়া যে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথই এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং তিনিই ইহার প্রথম বক্তা ছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে বঙ্গ-ঋষির কণ্ঠে প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন-গাথা উদ্গীত হইয়াছিল, সেই রাজা রামমোহনের যথার্থ ভাবানুজ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বজাতির মিলন মহোৎসবের উদ্বোধন-গীতি উচ্চারণ করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? বস্তুতঃ রামমোহনের এমন মন্ত্রশিষ্য ব্রজেন্দ্রনাথের মত আর কাউকে এ যুগে দেখা যায় নি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী যাঁহার সম্মাননা এমন ভাবে করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভার

বিশ্বজাতি-সম্মেলনের পুরোধা

পরিচয় আমরা কয়জনে জানি ? বিদেশে যাঁহার গলে বরমাল্য অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারই স্বদেশবাসীর নিকটে তিনি আজও যথাযোগ্য মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। ইহার কারণ, ব্রজেন্দ্রনাথ যথার্থই অনাসক্ত জ্ঞানযোগী। নিন্দা-স্তুতির তিনি অতীত, তাই তিনি সত্যিকার পণ্ডিত। বাহ্য আড়ম্বর, নামযশের আকাঙ্ক্ষা, সম্মান-প্রতিপত্তি, পাণ্ডিত্যাভিমান—কিছুই তাঁহাকে কলুষিত ও বিচলিত করিতে পারে নাই। অত বড় পণ্ডিত, অথচ একেবারে শিশুর মত সরল। এমন ভোলানাথ আর দ্বিতীয়টি নাই।

অনাড়ম্বর ও নিরভিমান

বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জ্ঞানের সার্থক পরিসমাপ্তি হইত সেই পরমপুরুষের পূতচরণে যাঁহাতে সকল জ্ঞান আসিয়া মিলিত হইয়াছে—'জ্ঞানমদ্বয়ম্' বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে যাঁহার বন্দনা গীত হইত। মনে হয়, ব্রজেন্দ্রনাথে সেই প্রাচীন কালের ঋষিদের জ্ঞান-শিখা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহার সকল জ্ঞান ছুটিয়া চলিয়াছে তাঁহারই পানে যিনি সত্যং শিবং সুন্দরং। এই পরম জ্ঞানী ও ধ্যানীর অসাধারণ মহোচ্চতাকে স্বীকার করিয়া তাঁহারই স্বদেশবাসী তাঁহাকে নতি জানাইতেছে।

জ্ঞানী ও ঋষি

আচার্য্য হরিনাথ দে

বাংলা দেশে প্রতিভাশালী পুরুষের অভাব কোনদিনই হয় নাই। কিন্তু আচার্য্য হরিনাথের মত অসাধারণ পণ্ডিত ও মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি এদেশে কমই দেখা গিয়াছে।

চৌত্রিশ বৎসর তাঁহার বয়স হইয়াছিল। যৌবন-সূর্য্য তখন মধ্যগগনে দীপ্যমান। এই অকালে আচার্য্য হরিনাথ সংসারের সকল বাঁধন ছিন্ন করিয়া জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন। বাংলার মহামনীষী বঙ্গ-ভুবন আঁধার করিয়া ১৩১৮ সালের ১৩ই ভাদ্র বুধবার মহাপ্রয়াণ করিলেন।

১৮৭৬ সালে হরিনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর মধ্যপ্রদেশস্থ রাইপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব ছিলেন। বড় বড় লোকদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, জননীর প্রভাব তাঁহাদের জীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই জন্য নেপোলিয়ান বলিতেন, মায়েরাই প্রকৃতরূপে জাতিকে গড়িয়া তুলেন। হরিনাথের জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার অসামান্য জ্ঞানস্পৃহার প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন তাঁহার স্নেহময়ী জননী। হরিনাথের জননী ইংরাজী, বাংলা, মারাঠী ও হিন্দি এই চারিভাষায় সুদক্ষা ছিলেন। মাকে হরিনাথ অত্যন্ত

মা ও ছেলে —বিদুষী মা



আচার্য্য হরিনাথ দে

ভালবাসিতেন। মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি চিরদিনই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শোনা যায়, পিতার নিকট হরিনাথ চার বৎসর বয়সে সমস্ত বাইবেল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই অধ্যয়নে হরিনাথের গভীর প্রীতি ছিল। তিনি প্রথমে মধ্যইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর সমস্ত পরীক্ষাতেই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হরিনাথ ১৮৯৭ সালে বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ঐ বছরই বিলাতে অবস্থানকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক্ ভাষায় এম্-এ পরীক্ষা দেন। তাঁহার এই পরীক্ষা বিলাতেই গৃহীত হয়। শুধু তাঁহার জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়মের এই ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল। এ পরীক্ষায় হরিনাথ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ছাত্র-জীবন—
স্বদেশে ও বিদেশে

কেম্ব্রিজের সর্ব্বোচ্চ ও কঠিন ট্রাইপস পরীক্ষা তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক্ কবিতার জন্য স্কীট্‌স পুরস্কার ও লর্ড চ্যান্সেলার পদক প্রাপ্ত হন। ইহা অত্যন্ত সম্মানজনক। ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন রাজকবি টেনিসন ও মিল্টন এককালে এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। একজন বাঙালী যুবকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় ছিল না।

কেম্ব্রিজে পাঠ সমাপন করিয়া হরিনাথ কিছুকাল জর্ম্মণী ও ফরাসী দেশে অধ্যয়ন করেন। তৎপর য়ুরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা সমাপন করিয়া তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে চাকুরী লাভ করেন।

এই চাকুরী পাইয়া তিনি কিছুদিন ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। তৎপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বদ্‌লি হইয়া আসেন। এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য্য হরিনাথের একজন প্রাক্তন ছাত্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

অধ্যাপক ও অধ্যাপনা

"একদিন শুনিলাম ঢাকা কলেজ হইতে প্রোফেসর হরিনাথ দে আমাদের পড়াইতে আসিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বেই আমরা তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত নাম শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে সকলেই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

"সাধারণতঃ নূতন শিক্ষক প্রথম আসিলে ছেলেরা তাঁহাকে একটু জ্বালাতন করে; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন ছেলেরা কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানি না তাঁহার বিশাল চক্ষু দুটির ভিতর কেমন একটা জ্যোতিঃ ছিল, তাঁহার কণ্ঠের স্বরে কেমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল, ছেলেরা সকলেই বেশ মনোযোগের সহিত তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল।

"সে সময়ে মিণ্টনের 'কোমাস' ও 'হেল্পসের এসেস্' আমাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। তিনি সেই পুস্তক দুখানি

আমাদিগকে পড়াইতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া কোমাসের allusionগুলি এত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে, আর দ্বিতীয়বার পড়িবার প্রয়োজন হইত না।”

অসাধারণ পণ্ডিত

য়ুরোপীয় আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্য এবং ভাষায় হরিনাথের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। শোনা যায়, একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুপণ্ডিত পার্সিভেল সাহেব নাকি ক্লাশের ছেলেদের নিকট হরিনাথের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'**Yes, he can teach me Latin and Greek for several years**—হাঁ, তিনি আমাকে বেশ কয়েক বছর ল্যাটিন ও গ্রীক্ শিখাইতে পারেন।' কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিয়া তিনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু অধ্যাপনায় তাঁহাকে আনন্দ দিত না, তাঁহার আনন্দ ছিল অধ্যয়নে। তিনি অনেক সময়ই বলিতেন—“এ কাজ আমার ভাল লাগে না; ইহাতে আমি ছেলেদেরও বিশেষ উপকার করিতে পারি না, নিজেরও কোন উপকার হয় না। বরং পড়াশুনার বড় ক্ষতি হয়।”

ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান

অবশেষে হরিনাথ তাঁহার ঈপ্সিত পদ লাভ করিলেন। কলিকাতা ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানের পদে তিনি অধিষ্ঠিত হইলেন। এইবার তাঁহার পড়ার সাধ মিঠাইবার পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। ইহার পর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন,

সারাটা জীবন কী পড়া-ই না পড়িয়াছেন। অমন আত্মভোলা অধ্যয়নশীল বড় দেখা যায় না।

অসাধারণ ছিল তাঁহার স্মৃতিশক্তি, তাই এই বয়সে এত বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একবারে অধিকক্ষণ পড়িতেন না এবং কখনও বেশী রাত্রি জাগিয়াও পড়িতেন না। অথচ যাহা পড়িতেন, কোন দিনও তাহা ভুলিতেন না। তাঁহার মেধা ও অধ্যবসায় অসামান্য ছিল। যখন তিনি নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতে বসিতেন, তখন বাহিরের শত কোলাহল, সংসারের ঝাট-ঝঞ্ঝাট তাঁহার ধ্যান ভাঙিতে পারিত না। পুঁথির মধ্যে অতন্দ্রিতভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। অনেক সময় তাঁহার চারিপাশে কত লোক আড্ডা জমাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু হরিনাথের সমগ্র মন পুঁথিতেই ডুবিয়া রহিয়াছে। কোনদিনও পরীক্ষার সময় তাঁহাকে চিন্তিত দেখা যায় নাই। দুদিন পরে পরীক্ষা, হরিনাথ মহা আনন্দে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প-গুজব করিয়া কাটাইতেছেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে লোকে সবিস্ময়ে দেখিল, হরিনাথের নাম সকলের উপরে।

অসামান্য স্মৃতি, মেধা ও অধ্যবসায়

জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত হরিনাথ ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাই তাঁহার কাল হইল।

আচার্য্য হরিনাথের মত বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত সমগ্র এশিয়া-খণ্ডে আর কেহ ছিল না। তিনি সর্ব্বসমেত ঊনত্রিশটি ভাষা

জানিতেন। তিনি দ্বিতীয়বার যখন য়ুরোপ গমন করেন, তখন বর্দ্ধমানের মহারাজার গাইড্ (পথপ্রদর্শক) ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা ইটালীতে যাইয়া রোম নগরে পোপের সঙ্গে দেখা করেন। পোপ বিদেশীয়দের সহিত সাক্ষাতের সময় ল্যাটিন ছাড়া অন্যভাষায় কথা বলিতেন না। ইটালীর প্রচলিত ভাষা ইটালীয়, ল্যাটিন আমাদের সংস্কৃতের ন্যায় উহাদের দেবভাষা। পোপের সঙ্গে আলাপের সময় হরিনাথ দ্বিভাষীর কাজ করিলেন। তিনি এমন চমৎকার ল্যাটিন বলিয়াছিলেন যে, পোপ একজন বিদেশী বিশেষতঃ ভারতবাসীর এরূপ দক্ষতা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন।

বহুভাষাবিদ্—উনত্রিশটি ভাষায় পাণ্ডিত্য

একবার রুষদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত বার্ব্বাটস্কি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি হরিনাথের পাণ্ডিত্যে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে সেণ্টপিটার্স্বর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন। হরিনাথ স্বদেশ ছাড়িয়া সুদূর রুষদেশে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না।

কত-বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত যে হরিনাথ ছিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসী তাহা ধারণা করিতে পারে নাই। তাই অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াই তাঁহাকে সংসার হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় হরিনাথ উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাঁহার পণ্ডিতম্মন্য দেশবাসী উহা কাণেও তুলিল না। তাচ্ছিল্যের সহিত শুধু টীপ্পনী কাটিল—হরিনাথ সংস্কৃতের

কি বুঝিবে? হরিনাথ ইহার কিছুদিন পরেই এই অমূলক কথার অসত্যতা ঘুচাইয়া দিলেন—তাঁহার বিরুদ্ধ দল দেখিয়া বিস্মিত হইল সেই প্রাপ্ত-বয়সে হরিনাথ সংস্কৃতে এম্ এ পরীক্ষা দিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন হরিনাথ,কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁহাকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। অমন সরল ও প্রাণ-খোলা মানুষ-টিকে দেখিলে কে বলিবে ইনিই বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত আচার্য্য হরিনাথ? যখন তিনি মোটা একখানি ধূতি পরিয়া বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সরস গল্প-গুজবে ও কলহাস্যে সারা ঘরখানি মুখরিত করিয়া তুলিতেন, তখন ভ্রমেও কেহ ভাবিতে পারিত না যে ইনিই বিখ্যাত হরিনাথ দে। বিদ্যা এবং বিনয় তাঁহার জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

পণ্ডিত ছিলেন, পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ছিলনা

ব্যক্তিগত জীবনে সারল্য ও সরসতা

এই মহামনীষী জীবনে নানাভাষা হইতে বহু জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশকে তাঁহার অংশীদার করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহাকে কিছু লিখিবার কথা বলিলে স্বভাব-সুলভ বিনয়-নম্র স্বরে উত্তর দিতেন—"শিখ্‌লাম কি যে লিখ্‌ব? এখনো শিখ্‌বার যথেষ্ট বাকী।" হরিনাথ সবেমাত্র লিখিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এমন সময় নিষ্ঠুর নিয়তির কঠোর পরিহাসে সব-কিছুই অসমাপ্ত রহিয়া গেল। নইলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য উপহার প্রদত্ত হইত।

তাঁহার অসমাপ্ত লেখার বিষয়-বৈচিত্র্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। হরিনাথ তিব্বতীয় ও চীন ভাষা হইতে অনেক বই অনূদিত করিতেছিলেন। সংস্কৃত শকুন্তলার একটি ইংরাজী সরল পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। আরো কত কি যে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনটাই শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের অনুসন্ধান ও আলোচনা করা তাঁহার জীবনের একটা বড় সাধ ছিল, কত সময়ে একথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন! নানাদেশীয় অনেকগুলি কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুক্তার মত লেখাগুলি বড়ই সুন্দর দেখাইত।

হরিনাথ অর্থের ভিখারী ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই সুখে-সাচ্ছন্দ্যে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছেন। নিজেও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। বিবিধ বৃত্তি ও পারিতোষিক হিসাবেই হরিনাথ ন্যূনাধিক বিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে বৃদ্ধা মা ও অনাথ স্ত্রীপুত্রাদির জন্য কোন সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। একমাত্র পানদোষ ব্যতীত কোন প্রকার বিলাসিতা বা ব্যয়বাহুল্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার পরিচ্ছদ সাধারণ রকমের ছিল। এই পানদোষই তাঁহার সর্ব্বনাশের অনেকখানি কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার উপর ছিল তাঁহার অসংখ্য দান। যে-কেহ প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া কোনদিন ফিরিয়া আসে নাই। এমন অনেক সময় হইয়াছে, পাওনাদার নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা লইতে

আসিয়াছে, হরিনাথ দিবার জন্য টাকা বাহির করিয়াছেন, এমন সময়ে বিপন্নের কাতর প্রার্থনা তাঁহাকে বিচলিত করিল। তিনি একান্ত নিরুদ্বেগে হাতের টাকা তাহাকে দিয়া দিলেন, পাওনাদার দুটা কড়াকথা শুনাইয়া চলিয়া গেল।

অর্থের দান

পুস্তকক্রয় তাঁহার জীবনের এক প্রধান সখ ছিল। ভাল বইর খোঁজ পাইলে, তৎক্ষণাৎ কিনিয়া আনাইতেন। কত রকম বিভিন্ন পুস্তক যে তাঁহার লাইব্রেরীতে স্থান পাইয়াছিল! নানা দেশের নানা ভাষার এরূপ বিচিত্র সংগ্রহ বোধ হয় আমাদের দেশের খুব কম লাইব্রেরীতেই আছে। হরিনাথের লাইব্রেরীর প্রত্যেকখানি বই তাঁহার পড়া ছিল।

বই কেনা জীবনের একটা সখ ছিল

ছাত্রদের জন্য হরিনাথের অনেকখানি দরদ ছিল। কত দরিদ্র ছাত্র যে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের যে ষ্টুডেণ্টস্ ফণ্ড আছে, উহা প্রধানতঃ হরিনাথের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি পাইয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ফণ্ড হইতে গরীব ছাত্রদের সাহায্য করা হইয়া থাকে। ইহাছাড়া ছাত্রদের সকল প্রকার অভাব-অভিযোগের প্রাতকারার্থ তিনিই তাহাদের মুখপাত্র হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যুঝিতে নামিতেন। ছাত্রগণও তাঁহাকে এইজন্য পরম শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত।

ছাত্রপ্রীতি

মৃত্যু-শয্যায় হরিনাথ শয়ান। স্নেহময়ী জননী হাতে রক্ষাবন্ধনী ও নয়নে হোমধূমের কাজল পরাইয়া দিলেন।

দীপ নিভিল

হায়! কিছুতেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। ব্যর্থ হইল মায়ের কাতর প্রার্থনা, বৃথা গেল দেবতার আশীর্ব্বাদ। হরিনাথ দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

বাঁচিয়া থাকিতে স্বদেশবাসী তাঁহাকে সম্মান করে নাই, মৃত্যুর পরে কেহ তাঁহাকে স্মরণ করে নাই। বিশ্বভারতীর বরপুত্র বাঙলার মহামনীষী আচার্য্য হরিনাথকে জাতীয় অভ্যুত্থানের জয়যাত্রার দিনে বাঙালী আজ আর ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না। আমরা ভক্তিশ্রদ্ধাভরে বারবার সেই স্বর্গত আচার্য্যের স্মরণ করিতেছি।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একাধারে কর্ম্মী ও জ্ঞানী, এরূপ মনীষী পৃথিবীতে কম দেখা যায়। এইরূপ একজন ছিলেন স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। একজন অসাধারণ পণ্ডিত লোক অক্লান্ত কর্ম্ম দ্বারা জাতীয় জীবনে কি করিতে পারেন, তাহার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্যর আশুতোষ। আশুতোষ মস্ত-বড় বিদ্বান্ ছিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আইনজ্ঞ ছিলেন, পারদর্শী শিক্ষা-বিশারদ ছিলেন; কিন্তু যাহা তাঁহাকে স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় সকলের নিকট সম্পূজ্য ও স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বাধীনতা-প্রিয়তা। এই স্বাধীনচেতা মনস্বী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বীরদর্পে ও গৌরবোন্নত মস্তকে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষের আদর্শ

ইহাঁরই জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়া বাংলার তরুণদিগকে জীবন-যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

১৮৬৪ সালে কলিকাতার বহুবাজারস্থ মলঙ্গা লেনে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার অন্তঃপাতী ভবানীপুরে ডাক্তারি করিতেন। তিনি সেকালের একজন খ্যাতনামা ও উদারচেতা চিকিৎসক ছিলেন। ভবানীপুরে রসারোডের বর্ত্তমান বাড়ীখানি গঙ্গাপ্রসাদই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।



স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে প্রথমে ভবানীপুরস্থ চক্রবেড়িয়া পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এখানকার পড়া শেষ হইলে আশুতোষ কিছুদিন পিতার তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষকের নিকট পড়িলেন এবং শেষে সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই স্কুলে তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন, বিখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

বাল্য জীবনী

আশুতোষ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত পাঠানুরাগী ছিলেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদের উপদেশ 'ভাল ক'রে শেখা চাই' তাঁহাকে পড়াশুনায় খুব উৎসাহিত করিত। বাসার সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে, তিনি চুপি চুপি আলো জ্বালিয়া পড়াশুনা করিতেন। পিতা যাহাতে টের না পান, সেজন্য অত্যন্ত সন্তর্পণে রাত্রে উঠিয়া পড়িতেন। গঙ্গাপ্রসাদ ছেলেকে কখনও বেশী রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা করিতে দিতেন না।

অসাধারণ পাঠানুরাগ

আশুতোষ খুব ভোরে উঠিতেন এবং প্রত্যহ পিতার সঙ্গে মাঠে বেড়াইতে যাইতেন।

গণিতে আশুতোষের অসামান্য অনুরক্তি ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময়ই তিনি এফ্-এ পরীক্ষার গণিত প্রায় সকলই শেষ করিয়াছিলেন। এই সময়ে আশুতোষের গৃহশিক্ষক ছিলেন কলিকাতা লণ্ডন মিশন কলেজের অধ্যাপক বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু মধুসূদন দাস এম্.এ। মধুসূদন দাস পরবর্ত্তী কালে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৭৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্-এ পড়িতে লাগিলেন। এফ্-এ ক্লাশে পড়িবার সময়ই তিনি এম্-এ পরীক্ষার অনেকগুলি গণিতের বই পড়িয়া ফেলিলেন। উচ্চতর গণিত শিক্ষার জন্য ফরাসী ভাষা শেখা আবশ্যক। আশুতোষ এই সময়ে ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত করেন। এফ্-এ পরীক্ষার পূর্ব্বে আশুতোষ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই অসুস্থ শরীর লইয়া পরীক্ষা দিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কলেজের জীবন

১৮৮৪ সালে আশুতোষ বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর বৎসর তিনি গণিতে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান লাভ করিলেন। এই সময়ে আশুতোষ কেম্ব্রিজের গণিত-বিষয়ক এক পত্রিকায় গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ফলে, তিনি বিলাতের এফ্-আর-এ-এস্ ও এফ্-আর-এস্-ই লাভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙালী এই পদ প্রাপ্ত হন নাই। গণিতশাস্ত্রে আশুতোষের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এই সময়ে একদিন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার আশুতোষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের অধীন ২৫০৲ টাকার একটি চাকুরী লইতে অনুরোধ করিলেন। আশুতোষ বলিলেন,

গণিতানুরাগ

যদি তাঁহাকে বিলাত-ফেরতাদের সমান মাহিনা দেওয়া হয় এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকুরী হইতে অন্যত্র বদলি করা না হয় তবে তিনি চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন। ডিরেক্টার ইহাতে স্বীকার পাইলেন না। আশুতোষও জবাব দিয়া আসিলেন—আমি চাই না।

আমি চাকুরী চাই না

একজন বাঙালী যুবকের মুখে এরূপ কথা শুনিবেন, ডিরেক্টার তাহা ভাবিতেও পারেন নাই। এই ঘটনার পর হইতে ডিরেক্টার সাহেব আশুতোষের উপর একটু বক্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

১৮৮৬ সালে কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর সহিত আশুতোষের বিবাহ হইল। গরীবের ঘরের এই দেবী-প্রতিমা গঙ্গাপ্রসাদ পরম আদরে ঘরে আনিলেন। অর্থের লোভ তাঁহার কোনদিনই ছিল না।

বিবাহ

বর্ত্তমানে আশুতোষের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। বড় মেয়ে বালবিধবা কমলাকে পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহাতে চারিদিকে তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা রটিয়াছিল। আশুতোষ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। এই মেয়েটির মৃত্যুতে আশুতোষ শেষ বয়সে বড়ই সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। মেয়েটিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

১৮৮৬ সালে আশুতোষ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে পুনরায় এম্-এ পরীক্ষা দিলেন। একাদিক্রমে

পনর দিন তিনি এই দুই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উভয় পরীক্ষাতেই পরম কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

ইহার দুই বছর পরে ১৮৮৮ সালে আশুতোষ বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি 'ডক্টর অব্ ল্ব' উপাধি লাভ করেন।

হাইকোর্টে ওকালতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ইল্‌বার্ট সাহেব একবার আশুতোষকে স্বগৃহে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি।' আশুতোষ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "আপনি ইচ্ছা করিলে আমার অনেক উপকার করিতে পারেন। কিন্তু আমি অন্য কিছু চাই না। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সিনেট সভার সভ্য নিযুক্ত করিয়া দিন।" সাহেব বলিলেন, "আমি তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত করিয়া দিব, তাহার জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ

কিন্তু ইল্‌বার্ট সাহেব শীঘ্রই নূতন চাকুরী লইয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন। কাজেই আশুতোষের সেবার আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ হইয়া উঠিল না। আশুতোষ ইলবার্ট সাহেবকে লিখিলেন, তাঁহার চিঠি পত্রে কোন কাজ হয় নাই। তিনি নূতন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনকে আশুতোষের কথা বলিয়া দিলেন। ইহার পরই ১৮৮৯ সালে আশুতোষ সিনেটের মেম্বর নিযুক্ত হইলেন, এবং দুই মাস পরেই তিনি সিণ্ডিকেটেরও সভ্য নির্ব্বাচিত

হইলেন। এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে অধ্যাপক বুথ, স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। এত অল্প বয়সে তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সিণ্ডিকেটের মেম্বর হইতে পারেন নাই। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৮ সালে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইনের' অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং "Law of Perpetuities in British India" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি-আই-ই মহোদয় মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়াছিলেন, "তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাসে একহাজার টাকা দিবার বন্দোবস্ত থাকে। উক্ত টাকার দশ হাজার টাকা দ্বারা একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞকে নিযুক্ত করিয়া ব্যবহার-শাস্ত্র বিষয়ে কোন বক্তৃতা এক বৎসর দেওয়াইতে হইবে। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই এই বক্তৃতা বিনা ব্যয়ে শ্রবণ করিতে পারিবেন। অতঃপর সেই বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত করিয়া বিতরিত হইবে।"

ইহার পর বছর (১৮৯৯ সালে) আশুতোষ বঙ্গীয় কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯০১ সালে পুনরায় ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৩ সালে তিনি ভারতীয় বড়লাটের কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই বছরই লর্ড কার্জ্জনের ভারতীয় ইউনিভার্সিটি আইন কমিটির সভ্য হইয়া উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহার পর ১৯০৬ সাল হইতে

১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি ক্রমান্বয়ে চারিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার হইলেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের এক বড় স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিল। আশুতোষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আশুতোষই ছিলেন ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি। এই অক্লান্ত কর্ম্মের এঞ্জিনটির কর্ম্মের বিরাম ছিল না, কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার লক্ষ্য ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কি যে দরদ দিয়া তিনি ইহাকে বর্ত্তমান আকারে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে আশুবাবুকেই বুঝাইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গগনচুম্বী দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস, ইহার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ, ইহার প্রাসাদোপম বিজ্ঞান-কলেজ, সর্ব্বোপরি ইহার বাংলা ভাষার প্রবর্ত্তন, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় ভাষা ও নানা বিদ্যার একত্র সমাবেশ—এ সমস্তই আশুতোষের জীবন-ব্যাপী প্রচেষ্টার ফল। স্যর রাসবিহারী বসু, তারকনাথ পালিত, খয়রার রাজকুমার এবং অন্যান্য বদান্যব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয়কে যে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহা শুধু আশুতোষের মুখের দিকে চাহিয়াই তাঁহারা দিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -প্রাচী ও প্রতীচীর জ্ঞান-মন্দির আশুতোষের সৃষ্টি

"বিশ্ববিদ্যালয়টি আশুতোষ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এখানে বিদ্যার যে সমারোহপূর্ণ উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে

পৃথিবীর সর্ব্বজাতির ডাক পড়িয়াছিল। প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার ও প্রাচ্য ভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। রুশিয়ার স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি পল ডিনোগ্রাডফ এই নিমন্ত্রণে এখানে আসিয়াছিলেন। ফরাসীর প্রাচ্যবিদ্যার শিরোমণি সিলভ্যাঁ লেঁভি, জার্ম্মানির উইণ্টারনিজ ও ওল্ডেনবার্গ, বিলাতের প্রাচ্য-বিদ্যার কল্পতরু টমাস প্রভৃতি কত দেশেরই পণ্ডিতগণ আশুতোষের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের পদরজ দিয়া গিয়াছেন। এদিকে অধ্যাপকগণের মধ্যে জাপানী, চৈনিক, দ্রাবিড়ী, সিংহলী, মারহাট্টা,তিব্বতীয় প্রভৃতি নানা দিগ্‌দেশাগত পণ্ডিতেরা তো আমাদের বিদ্যাপীঠ অবিরত কলরবে খখরিত করিতেছেন। কনভোকেশনের সময়ে সে কি দৃশ্য! কাহারো উষ্ণীষে রামধনুর বর্ণ খেলিতেছে, কাহারও কৃষ্ণটুপি মন্দিরের চূড়ের মত উঁচু হইয়া আছে, আবার একদিকে পার্ব্বত্য লামার রোমাবৃত শিরোভূষণের পার্শ্বদেশ চুম্বন করিয়া সিরাজাগত মৌলভীর প্রকাণ্ড পাগড়ীর স্বর্ণখচিত রেখাগুলি দেখা যাইতেছে! আমাদের এই বিদ্যাশালাকে তিনি সর্ব্বজাতির মিলনস্থল জগন্নাথ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন।” সত্যই আশুতোষ ছিলেন ‘একটা জাতি গড়িবার বিশ্বকর্ম্মা।’

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বাঙালীকে জগৎ-সভায় গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ১৮৯১ সালে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তনের

প্রস্তাব করেন। সে সময়ে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। যুবক আশুতোষের সেদিনকার অনলবর্ষী বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। আশুতোষ যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন, তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন, কবে সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে। তারপর বহুবর্ষ পরে যেদিন সে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল, সেদিন প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে এম্-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তিত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার প্রতি আশুতোষের একটা গভীর অনুরক্তি ছিল। বাংলা ভাষা ছিল তাঁহার পূজ্য ও আরাধ্য, বাংলা ভাষা ছিল তাঁহার অন্তরের মধ্যমণি। বাংলা ভাষায় তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু সাহিত্যিক সৃষ্টির উপায় করিয়া গিয়াছেন। বাঁকীপুর দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃ-ভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত

বঙ্গ-ভারতীর একনিষ্ঠ সেবক

দেশবাসিগণ আচারে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে; কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্র স্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। কবে শুনিব শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ব সমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গ-ভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভুত হয় যে, সেদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্য ধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্র ক্ষণ।”

স্বাজাতিকতা ও স্বাদেশিকতা

সব চেয়ে ভালবাসিতেন আশুতোষ বাঙালী জাতিকে। যাহা-কিছু বাঙালীর, সকলই তাঁহার চোখে পরম গৌরব ও আদরের ছিল। এই স্বাজাতিকতা আমরণ তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব ছিল। ১৯১৭ সালে যখন স্যাড্‌লার সাহেবের সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিলেন সেই সময়ে উক্ত কমিশনে একমাত্র আশুতোষই বাঙালীর পোযাক ধূতি চাদর পরিয়া সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিয়াছেন। সেই সময়ে একবার তাঁহারা মহীশূরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মানার্থ মহীশূর-রাজ এক ভোজসভা আহ্বান করেন। সেই

সভায় আশুতোষকে নগ্ন মস্তকে আসিতে দেখিয়া রাজার মন্ত্রী বলিলেন, "আপনি ক'মিনিটের জন্য এই উষ্ণীষটি মাথায় পরুন, মহীশূরের রাজসভায় কাহারও খালি মাথায় যাইবার নিয়ম নাই।" আশুতোষ উত্তর দিলেন "তাহা পারিব না। কোথাও স্ববেশ পরিত্যাগ করি নাই, এখানেও করিব না। চলিলাম।" এই বলিয়াই আশুতোষ একেবারে বাসায় যাইয়া হাজির হইলেন। এদিকে সভায় সকলেই আসিয়াছেন,সময় হইয়াছে,অথচ আশুতোষ অনুপস্থিত। রাজা, মন্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে দুই ধমক দিয়া রাজপুত্রকে আশুতোষের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। ধূতি চাদর পরিয়া খাঁটি বাঙালীর বেশে আশুতোষ হাসিতে হাসিতে সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি

বাল্যকাল হইতেই আশুতোষের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল হাইকোর্টের জজ হওয়া। কলেজে তিনি অনেক সময় প্রকাশ্য ভাবে বলিতেন, তিনি হাইকোর্টের জজ হইবেন। তাঁহার এই আশা সফল হইল ১৯০৪ সালে। এই বছর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। ১৯২০ সালে তিনি কয়েক মাস অস্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্ব্বে তিনি হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আশুতোষের মত সূক্ষ্মদর্শী ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক কমই দেখা যায়। "স্যর আশুতোষ তাঁর দীর্ঘকালের জজিয়তিতে যে সব

নজীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে যে ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তার খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলেও একটি মহাভারত লিখিতে হইবে। গত বিশ বৎসরের মধ্যে প্রিভি কাউন্সিল ও ভারতের সকল হাইকোর্টে যতগুলি নজীর প্রকাশিত হইয়াছে, তার মধ্যে পরিমাণের দিক্ দিয়াই দেখ আর উৎকর্ষের দিক্ দিয়াই দেখ, স্যর আশুতোষের প্রণীত নজীর অন্য সকল নজীরের অন্ততঃ সমান দেখিতে পাইবে। আর তার মধ্যে খুব বেশীর ভাগ রায়ই আইনের নানাপ্রশ্নের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপূর্ণ এক বিরাট প্রবন্ধবিশেষ। স্যর আশুতোষের রায়ের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি কখনও কেবল মাত্র অন্ধভাবে পুরাতন নজীর অনুসরণ করিয়া যাইতেন না। কোনও আইন-ঘটিত সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি মৌলিক তথ্যগুলি অনুশীলন করিয়া তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিশিষ্ট তথ্য নিষ্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। বিচার কার্য্যে তিনি বহুস্থানে তাঁর নির্ভীকতা ও স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন।……হাইকোর্টের গৌরব স্যর আশুতোষের কাছে বড় মূল্যবান্ ছিল।"

বিচার-নৈপুণ্য

হাই কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুভার কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার কর্ম্মের ইয়ত্তা ছিল না। আশুতোষ জ্ঞানী ছিলেন, ভাবুক ছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশী ছিলেন কর্ম্মী। দেশের এমন কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট না ছিলেন—

শুধু সংশ্লিষ্ট থাকা নয়, সবটারই কর্ণধার তাঁহাকেই হইতে হইয়াছে। এক বিশ্ববিদ্যালয়েরই ২০।২২টি কমিটির তিনি সভাপতি ছিলেন। এই প্রত্যেক কমিটিতে তিনি শুধু সাক্ষী গোপাল ছিলেন না, উহাদের কার্য্য পরিচালনা ও আলোচনায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। আশুতোষ তিনবার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনদিন তিনি যোগদান করেন নাই বটে, কিন্তু দেশের শত শত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। আশুতোষ দিবারাত্রি বিপুল ও বিরাট কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমান হইয়াও জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে কোন দিন বিচ্যুত হন নাই। আদর্শের সঙ্গে কর্ম্ম-কুশলতার এরূপ অপূর্ব্ব মিলন বড়ই বিরল। এই আদর্শানুরক্তি তাঁহার জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব। ছোট হোক্ বড় হোক্ সব-কিছুই তিনি একটা মহান্ ও উচ্চ আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখিতেন। এই কথাটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা গৃহে আশুতোষের মর্ম্মর মূর্ত্তি উন্মোচনের উৎসব দিবসে বাঙ্‌লার লাট কারমাইকেল সাহেব বলিয়াছিলেন—"কোন একটা জিনিষকে বিরাট কল্পনায় আয়ত্ত করিবার শক্তি আশুতোষের আছে, কিন্তু সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি অনেকের নাই, আশুতোষের তাহাও আছে।"

অসাধারণ কর্ম্মী—আদর্শানুরক্তি ও কর্ম্মকুশলতার অপূর্ব্ব মিলন

যাঁহারা নিরন্তর অসংখ্য কর্ম্মের চাপে থাকেন, তাঁহাদের

ভিতরকার কোমল বৃত্তিগুলি অনেক সময় মরিয়া যায়। সাহেবদের ব্যবহারিক জীবন এইজন্য অনেকটা বাহ্য নীরস ভদ্রতায় পরিণত হইয়াছে। এ বিষয়ে আশুতোষের জীবনে প্রাচ্য ভাব সর্ব্বদা পরিস্ফুট ছিল। তাঁহার দ্বার ছোট বড় সকলের জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার নিজেরও কোন লৌকিকতা ছিল না। হয়ত খালি গায়ে বসিয়া পড়ার ঘরে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন এমন সময় ডিরেক্টার হর্ণেল সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সাহেব ঘরে ঢুকিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছেন, আশুতোষ হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন, Come in Hornell। নিজের নগ্ন শরীরের প্রতি ভ্রুক্ষেপও নাই। এমন স্বদেশীয়ানা আজিকার দিনে বড়ই বিরল।

সরলতা ও সহৃদয়তা

তিনি গভর্ণমেণ্ট হাউসে লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতেও ধুতি চাদর পরিয়া যাইতেন। লোকে সেকালে অবাক্ হইয়া দেখিত। নিয়মনিষ্ঠা ও সময়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী যাহা আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা আশুতোষের পূর্ণমাত্রায় ছিল। এ বিষয়ে ছোট একটি ঘটনা বলিতেছি। একবার সিনেট হাউসে কি একটা মিটিং ছিল। হাইকোর্টের কাজ করিয়াই সিনেট হাউসে রওনা হইবেন। দেখিলেন, বৃষ্টি হইয়া রাস্তাঘাট একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে, গাড়ী, মোটর, ট্রাম সকলই বন্ধ। আশুতোষ এক রিক্শায় চড়িয়া বসিলেন। রিক্শাওয়ালা

কর্ম্মনিষ্ঠা

জলের উপর দিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। আশুতোষের জামা-কাপড় একেবারে ভিজিয়া গেল।

আশুতোষের জীবনকে যাহা সব চেয়ে বরণীয় ও স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাঁহার একান্ত স্বাধীনতাপ্রিয়তা।

নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা

শেষ জীবনে তিনি যে নির্ভীক তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পরাধান দেশে জন্মিয়া এ পর্য্যন্ত কাহারো মুখে শোনা যায় নাই। কি সে বজ্রগম্ভীর উক্তি! সত্যই পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি বলিয়াছিলেন, "ফরাসীদেশে জন্মগ্রহণ করিলে এই বঙ্গীয় শার্দ্দূল ফরাসী-ব্যাঘ্র ক্লেমেন্স্ অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। ইউরোপে তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি নাই।"

আশুতোষ যেমন স্বাধীনচেতা ছিলেন, তেমনি সাহসীও ছিলেন। একটি গল্প বলি। "স্যার আশুতোষ তখন

সাহসী ও স্বাধীনচেতা

ইউনিভার্সিটি কমিশনে ছিলেন। কমিশনের কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে আলিগড়ে যাইতে হয়। আলিগড় হইতে ফিরিবার সময় তাঁহার গাড়ীতে একজন ইংরাজ মিলিটারী অফিসার উঠে। গাড়ী খানিকদূর চলার পর স্যর আশুতোষের একটু তন্দ্রা আসে। এই সুযোগে সেই মিলিটারী অফিসারটি আশুবাবুর নূতন নাগরা জুতাটী, যাহা তিনি সদ্য পশ্চিম হইতে কিনিয়াছিলেন, বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ইহার অব্যবহিত পরেই স্যর

আশুতোষের তন্দ্রা ভাঙ্গে। তন্দ্রা ভাঙ্গিতেই তিনি দেখেন যে তাঁহার নূতন নাগরা জুতাজোড়াটি নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, কি হইয়াছে। বাক্য ব্যয় না করিয়া তিনি মিলিটারী অফিসারের কোটটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। খানিক পরে মিলিটারী অফিসারটীর ঘুম ভাঙ্গিল, ঘুম ভাঙ্গিতেই সে কোটটীর জন্য মহা তম্বী আরম্ভ করিল। স্যর আশুতোষ অবিচলিত ভাবে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "Your coat has gone to fetch my shoes." (তোমার কোট আমার জুতা আনিতে গিয়াছে)। মিলিটারী অফিসার আর কি করিবেন? কিছুক্ষণ গরগর করিতে করিতে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।"

তোমার কোট আমার জুতা আনিতে গিয়াছে

বিলাতে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে যোগদান করিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন আশুতোষকে নিমন্ত্রণ করেন। আশুতোষ উত্তরে লিখিলেন যে তাঁহার মা'র ইচ্ছা না যে তিনি বিলাত যান। লর্ড কার্জ্জন লিখিলেন, "Tell your mother that the Viceroy and Governor-General of India commands her son to go." —তোমার মাকে বল যে সম্রাটের প্রতিনিধি এবং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার পুত্রকে যাইতে আদেশ করিতেছেন।" আশুতোষ ইহার উত্তরে নিঃশঙ্কচিত্তে বলিয়াছিলেন—"Then I will tell the Viceroy and Governor-

কার্জ্জন ও আশুতোষ

General of India that Ashutosh Mukherjee refuses to be commanded by any person except his mother, be he the Viceroy or be he some body higher still." —"তা হলে আমি সম্রাটের প্রতিনিধি এবং গবর্ণর-জেনারেলকে বলিতেছি যে আশুতোষ মুখার্জ্জি তাঁহার মাতার আদেশ ব্যতীত অন্যের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতেছে—তা সে রাজপ্রতিনিধিরই হউক বা অন্য কোন উচ্চতর ব্যক্তির হউক।"

আশুতোষের এই তেজ ও বীর্য্যের নিকট সকলকেই মাথা নত করিতে হইয়াছে। তাঁহার জীবন-নাট্যের যবনিকাপাতের প্রাক্কালে আশুতোষ যে পৌরুষ তেজস্বিতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা পরাধীন দেশে কেন স্বাধীনদেশেও বড়-একটা দেখা যায় না। বাংলার কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া যখন উহাকে একটি প্রায় সরকারী যন্ত্রে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেই সময়ে আশুতোষ তাহার যে তেজস্বী উত্তর প্রদান করেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। লর্ড লীটনের সঙ্গে আশুতোষের যে পত্র-ব্যবহার হয় তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইবে। ১৯২২ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের বিখ্যাত বক্তৃতায় আশুতোষের সেই অনলবর্ষী উক্তি স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক নরনারীর মুক্তি-মন্ত্র হইয়া রহিবে। সেইদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"You give me

লর্ড লীটন ও আশুতোষ

slavery with one hand and money with the other. I despise the offer. I will not take the money.

Freedom first, Freedom second, Freedom always

We shall retrench and we shall live within our means We will starve. We will go from door to door, all through Bengal. I will tell my post-graduate teachers to starve their families but to keep their independence. I tell you, as members of this University, stand up for the rights of the University. Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India. Do your duty as senators of this University. Freedom first, freedom second, freedom always.

মুক্তি-মন্ত্রের উদ্গাতা

"তুমি একহাতে দিতে চাও অর্থ, অপর হাতে দাসত্ব। এরূপ দান ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করি। এ টাকা চাই না। আমরা ব্যয় কমাইয়া দিব এবং আমাদের আয়ের মধ্যেই থাকিতে চেষ্টা করিব। আমরা উপবাসী রহিব। সারা বাংলায় দ্বারে দ্বারে যাইয়া ভিক্ষা মাগিব। আমার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট অধ্যাপকদিগকে বলিব, তোমাদের পরিবার না খেয়ে মরুক, তোমরা স্বাধীনতা বজায় রাখ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার

রক্ষার জন্য ইহার প্রত্যেক সভ্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ান। ভুলিয়া যান বাংলা গভর্ণমেণ্টকে। ভুলিয়া যান ভারত-গভর্ণমেণ্টকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হিসাবে আপনাদের কর্ত্তব্য করুন। স্বাধীনতাই আমার প্রথম কথা, স্বাধীনতাই আমার চরম কথা।”

‘বাংলার বাঘের’ এই কথা বাঙালী কোনদিন ভুলিতে পারিবে না।

পাঁচ বার ভাইস্-চ্যান্সেলার

১৯২১ হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত আশুতোষ পঞ্চম বার ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। এই সময়েই লর্ড লীটনের সঙ্গে তাঁহার উপরি-উক্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। আশুতোষ নিম্নলিখিত উপাধি গুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজদত্ত—নাইট্, সি-এস্-আই; বিশ্ববিদ্যালয় লব্ধ—এম্-এ, ডি-এল্; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত—এফ্-আর-এ-এস্; এফ্-আর-এস্-ই; নবদ্বীপ ও ঢাকার সারস্বত সমাজ কর্ত্তৃকপ্রদত্ত—শাস্ত্রবাচস্পতি, সরস্বতী; বৌদ্ধসঙ্ঘকর্ত্তৃক প্রদত্ত—সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী।

শেষ প্রয়াণ

ইহার পর আশুতোষ আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। ১৯২৪ সালে ডুমরাঁওর মহারাজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার পক্ষে একটি মোকদ্দমা লইয়া পাটনায় গিয়াছিলেন। সেই সময়েই মাত্র তিন দিন রোগ ভোগ করিয়া ২৫শে মে রবিবার সন্ধ্যার পর পাটনাতেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় লইয়া আসা হইল।

সেই সময়ে কলিকাতাবাসী যে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া মৃত মনীষীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।

আশুতোষ চলিয়া গিয়াছেন, রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার স্বাদেশিকতা, তাঁহার পৌরুষ তেজস্বিতা, তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা, তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি। এই অবদান মাথায় লইয়া বাংলার তরুণদিগকে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

যিনি এদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রবর্ত্তকরূপে জাতীয় জীবনে এক নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন তিনিই যশস্বী রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮২৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শুঁড়া নামক পল্লীগ্রামে রাজেন্দ্রলাল মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলালের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র দিল্লীর বাদশাহের দরবারে অযোধ্যার নবাব উজীরের উকীল ছিলেন। তিনি একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। নিজের কর্ম্মদক্ষতা ও প্রতিভাবলে তিনি সম্রাটের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া 'সেহাজারি মন্‌সব্' অর্থাৎ তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি এবং দোয়াবের অন্তর্গত এলাহাবাদের চল্লিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কারা জেলায় দুই লক্ষ বিশ সহস্র টাকা আয়ের জায়গীর পাইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবে পীতাম্বর মিত্রের অধিকাংশ জায়গীর নষ্ট হইয়াছিল। তৎপর তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্রের অমিতব্যয়িতার ফলে অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। তিনি কটকের কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন।



ডাঃ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র

বৃন্দাবনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মেজয় মিত্রই রাজেন্দ্রলালের পিতা। জন্মেজয় মিত্র সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল পিতার তৃতীয় পুত্র, তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ ছয় ভাই ছিলেন, বাল্যকালে রাজেন্দ্রলাল তাঁহার এক নিঃসন্তান পিসীমার বাড়ীতে লালিতপালিত হন। পাঁচ বছর বয়সের সময় তিনি বাংলা ও পারশি ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিছুদিন তিনি কলিকাতা বড়বাজারের রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পারিবারিক পাঠশালায় পড়েন। তৎপর পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেমচন্দ্র বসুর বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার বয়স এগার বছর সেই সময়ে তিনি গোবিন্দচন্দ্র বসাকের প্রতিষ্ঠিত এংলোইণ্ডিয়ান একাডেমীতে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে রাজেন্দ্রলালের স্কুলে পড়া বন্ধ হইয়া গেল। এই সময়ে তাঁহার পিসীমাতার মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার এক আত্মীয় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কারণে রাজেন্দ্রলালের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। বাড়ীতেই তাঁহাকে ইংরেজী শিখাইবার জন্য ক্যামিরণ নামক একজন সাহেব নিযুক্ত হইলেন।

১৮৩৮ সালে চৌদ্দ বছর বয়সের সময়ে রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হইলেন। এই সময়ে তিনি একবার সাংঘাতিক জ্বররোগে পীড়িত হইয়া পড়েন। সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘকাল পরে এই দুরন্ত

জ্বররোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি আবার মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। মেডিকেল কলেজে তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক পারিতোষিক ও বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একবার আমাদের বুড়োবুড়ীদের ব্যবহার্য্য মুষ্টিযোগের এক বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ সাহেবের বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনি বিশেব খ্যাতিমান্ ছিলেন। ১৮৪২ সালে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গমনকালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের দুইটি ছাত্রকে নিজব্যয়ে বিলাতে ডাক্তারি বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ করিবার জন্য লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল একজন ছিলেন। কিন্তু পিতা ও আত্মীয়স্বজন সমুদ্রযাত্রায় আপত্তি করাতে তাঁহার আর বিলাত যাওয়া ঘটে নাই। এই সময়ে মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র দুর্ব্যবহারের জন্য কলেজ হইতে বিতাড়িত হন। প্রকৃত অপরাধকারীর নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়াতে রাজেন্দ্রলালও সমপাঠীদের সহিত বিতাড়িত হইলেন।

ইহার পর রাজেন্দ্রলাল আইনশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যেবার তিনি আইন পরীক্ষা দিলেন, সেবার পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি গেল। কাজেই সে পরীক্ষা অগ্রাহ্য হইল। রাজেন্দ্রলাল আর পরীক্ষা দিলেন না। বারবার এইরূপে জীবনের প্রবেশ-পথে বাধা পাইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব

ত্যাগ করিলেন এবং একান্তমনে নিজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৮ বছর।

পরম নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সহিত তিনি চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিলেন। এই চারি বছরে তিনি অনেকগুলি ভাষায় কৃতবিদ্য হইলেন। সংস্কৃত, ইংরেজী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মন, পারস্য, হিন্দী, উর্দ্দু, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলা তো আছেই।

বাইশ বছর বয়সের সময় রাজেন্দ্রলাল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর এই পদে তিনি দশ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দশ বৎসর তাঁহার অধ্যয়ন ও জ্ঞানানুশীলনে কাটিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটীর নানাভাষার মূল্যবান্ গ্রন্থসমূহ এবং ইহার সুবিজ্ঞ য়ুরোপীয় সেক্রেটারীগণ তাঁহার ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ তৈরী করার পরম সহায়ক হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল জ্ঞানচর্চ্চার পর তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ন্যাল নামক ইংরেজী কাগজে গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি সোসাইটীর গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত তালিকা মুদ্রিত করেন।

ঐ বছরই তিনি কামন্দকীয় নীতিসার নামক পুস্তকও প্রকাশ করেন। ১৮৫১ সালে তিনি "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত

হইত। ইহাই বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বিলাতের পেনী ম্যাগাজিনের অনুকরণে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। সাত বৎসর ইহা বাঁচিয়া ছিল। ইহা বন্ধ হইবার পর ১৮৫৮ সালে রাজেন্দ্রলাল রহস্য-সন্দর্ভ নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি চারি বছর ইহার সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ইহার পর রাজেন্দ্রলাল অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য বই লিখেন। ইহাদের মধ্যে প্রাকৃত ভূগোল, শিল্পিকদর্শন, পত্রকৌমুদী, ব্যাকরণ-প্রবেশ, শিবাজীর চরিত্র, মিবারের ইতিহাস বিখ্যাত ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষের বাংলা, হিন্দী ও পারশি মানচিত্র, এসিয়ার পারশি মানচিত্র ও প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ সালে রাজেন্দ্রলালের গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা-প্রসূত বিখ্যাত গ্রন্থ 'এণ্টিকুইটিস্ অব ওড়িষ্যা' (Antiquities of Orissa) প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব লেখনীশক্তির পরিচায়ক। দেশ-বিদেশের মনীষিগণ উহা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ব্যতীত ইংরেজীতে বুদ্ধগয়া, ললিতবিস্তর, পাতঞ্জল যোগসূত্র, নেপালের বৌদ্ধ সাহিত্য ও ইণ্ডো-এরিয়ান নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সকল গ্রন্থ ও সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা রিভিউ, এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশের ফলে পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীর নিকট রাজেন্দ্রলাল ভূয়সী সম্মান ও যশ লাভ করিতে সমর্থ হন।

য়ুরোপের নানাদেশের বিদ্বৎ-সভা তাঁহাকে নিজেদের সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ফরাসী গভর্ণ-মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ তাঁহাকে তালপত্রে অঙ্কিত ডিপ্লোমো (Palmleaf Diploma) প্রদান করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল সর্ব্বসমেত পঞ্চাশখানা গ্রন্থ প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিয়া নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

১৮৬৬ সালে রাজেন্দ্রলাল মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনে গভর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউটের ডাইরেক্টার হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের নাবালক জমিদার-পুত্র ও রাজ-তনয়দের শিক্ষা-দীক্ষার ভার ইহার উপর ন্যস্ত ছিল। এই ইন্‌ষ্টিটিউট যতদিন বাঁচিয়া ছিল, ততদিন রাজেন্দ্রলাল এই পদে বৃত ছিলেন। ১৮৮১ সালে উহা উঠিয়া গেলে গভর্ণমেণ্ট রাজেন্দ্রলালকে মাসিক পাঁচশত টাকা পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক এল্‌-এল্‌ডি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি যথাক্রমে রায় বাহাদুর, সি-আই-ই ও রাজা উপাধি লাভ করেন।

রাজেন্দ্রলাল একদিকে যেমন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান ও জ্ঞান-চর্চ্চায় ব্রতী ছিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশহিতকর নানা অনুষ্ঠানেও আত্মনিয়োগ করিতেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতার টাউন হলে তিনি ব্ল্যাক এ্যাক্ট-এর সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে অনেক ইংরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে ভীষণ

চটিয়া গিয়াছিল। এই আইন দ্বারা ইংরেজ ও ভারতবাসীকে একবিধ আইনের শাসনাধীন করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহা লইয়া সেকালের সাহেব মহলে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক বিখ্যাত জমিদার সভা স্থাপিত হয়। রাজেন্দ্রলাল উহার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিত্ত স্বদেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সতত ব্যগ্র ছিল। সুলেখক ও সুবক্তা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

১৮৮৫ সালে রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি পদে বৃত হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙালী যিনি এই সম্মান-জনক পদ লাভ করেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়টের তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন উহার সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য ও সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটীর সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। রাজেন্দ্রলাল উহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৮৯৬ সালে ২৬ শে জুলাই ৬৭ বৎসর বয়সে বাংলার জ্ঞানগুরু এই মহামনীষী পরলোক গমন করেন। রাজেন্দ্রলাল বাঙালীর জ্ঞানালোচনা ও গবেষণার পথপ্রদর্শকরূপে জাতির চিরকালের নমস্য হইয়া রহিয়াছেন।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গায় ১৮৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বড়ে গ্রামে ছিল।

"গুরুদাসের পিতামহ কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল হইতে নারিকেলডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। স্যর গুরুদাসের পিতৃদেব ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাহারা তাঁহাকে চিনিতেন, তাহারাই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত "কার ঠাকুর কোম্পানীর" আফিসে রামচন্দ্র পঞ্চাশটাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনা পূজা-আহ্নিকে একটু বেলা হইত, সুতরাং আফিসে উপস্থিত হইতে একটু বিলম্ব হইত। অন্য কর্ম্মচারীদের বিলম্ব হইলে তিরস্কৃত হইতে হইত, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিত না। এ বিষয় লইয়া অন্যান্য লোক যখন কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত করিতে আরম্ভ করিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিকারপরায়ণ হইলেন; কিন্তু এই নিষ্ঠাবান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীকে তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া "হাজিরা বহি"খানির ভার তাঁহার উপর দিলেন। সকলের যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার উপর দৃষ্টি

রাখিতে গিয়া তিনি আপনা হইতেই ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার লোকান্তর গমন জন্য স্তর গুরুদাসের পিতৃগৃহে দৈন্যদশার সংঘটন হয়। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের আফিস হইতে পেনসন হিসাবে মাসে কিছু টাকা মঞ্জুর করিবেন এমন সময়ে নানা বিপৎপাতে আফিস উঠিয়া গেল। সে সাহায্য দানের আর সুবিধা ঘটে নাই। এই অকাল মৃত্যু নিবন্ধন গুরুদাসের পিতৃপরিবার তাঁহার বাল্যবস্থায় দারিদ্রক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।”

যখন রামচন্দ্রের মৃত্যু হয় তখন গুরুদাসের বয়স মাত্র দুই বৎসর দশ মাস। পিতার মৃত্যুর পর হইতে গুরুদাস মাতার হস্তেই লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম সোনামণি দেবী। সোনামণি দেবীর প্রভাব গুরুদাসের সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তিনি আদর্শ নিষ্ঠাবতী হিন্দু নারী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষায় গুরুদাস মানুষ হইয়াছিলেন। তাই আমরা গুরুদাসকে একজন আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-রূপে দেখিতে পাইয়াছি। গুরুদাস যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, জননীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিতেন।

পারিবারিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল হইলেও সোনামণি দেবী পুত্রকে মানুষ করিবার দায়িত্ব বুঝিতেন। নিজের সকল স্নেহ ও শাসনদ্বারা পুত্রকে বাল্য বয়স হইতেই শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। গুরুদাসকে মাতা কখনও বাড়ীর বাহিরে অন্যান্য



স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেপিলের সঙ্গে খেলা করিতে দিতেন না। সকলকে গুরুদাসের বাড়ীতে আসিয়া খেলিতে হইত। এইরূপ সতর্ক আবেষ্টনীতে গুরুদাসের জীবন গঠিত হইতে লাগিল। যাহাতে গুরুদাস বাজে ছেলের সঙ্গে না মিশেন, সে বিষয়ে মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

সোনামণি দেবী কখনও ছেলেকে মারিতেন না। ছেলেকে মারিয়া শিক্ষাদানের তিনি অত্যন্ত নিন্দা করিতেন।

গুরুদাসের শিক্ষা প্রথমে নাড়িকেলডাঙ্গার পাঠশালায় আরম্ভ হয়। কিন্তু ওখানে বেশীদিন পড়া হইল না। তিনি জেনেরল এসেম্ব্লি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। এখানে কিছুকাল পড়িবার পর তাঁহার মাতুল তাঁহাকে গৌড়মোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গুরুদাসের পড়ার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার জননীর এই ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না। তিনি ছেলেকে নিজের কাছে রাখিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া গড়িতে ইচ্ছা করিলেন। কাজেই কিছুকাল পরে গুরুদাস হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। হেয়ার স্কুলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন যে অষ্টম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী এবং পর বৎসর পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম হইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাইলেন।

হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় বাংলার সুবিখ্যাত ইংরেজী শিক্ষক স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের প্রভাব তিনি বিশেষভাবে

প্রাপ্ত হন। এই আড়ম্বর-শূন্য আদর্শ শিক্ষকের অগাধ জ্ঞান ও সরল আচার-ব্যবহার গুরুদাসের জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

গুরুদাস যেবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন, তখন অত্যন্ত অসুখে ভুগিতেছিলেন। অসুস্থ শরীরে পরীক্ষা দিলেও গুরুদাস এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্.এ পড়িতে ভর্ত্তি হইলেন। এইখানে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক কাউয়েল, সাট্‌ক্লিফ্, সাউণ্ডার্স, লব, জোন্স, রিস, প্যারিচরণ সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সুধীগণের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্যারিচরণ সরকার মহাশয় এই সময়ে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। গুরুদাস ভাল রচনা লিখিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। একদিন এক খারাপ কাগজে তিনি রচনা লিখিয়া আনিয়াছিলেন। প্যারিচরণ উহা দেখিয়া উহার উপর মন্তব্য লিখিয়া দিলেন—"রচনা উত্তম হইয়াছে, কিন্তু কাগজখণ্ড লেখকের ঔদাসীন্যের পরিচায়ক।" মিঃ রিস্ গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। গুরুদাসের গণিতে বিশেষ অনুরক্তি ছিল। রিস্ সাহেব তাঁহাকে তজ্জন্য স্নেহ করিতেন। অধ্যাপক কাউয়েল ইতিহাস পড়াইতেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যেও পরম পণ্ডিত ছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাহার মত অমন নিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক কম দেখা যায়। এমন কতদিন গিয়াছে, কলেজের ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, তাঁহার অধ্যাপনা শেষ হয় না, তাঁহার দেরী দেখিয়া তাঁহার পত্নী হয়ত গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

আর একজন সুবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। ইহার বাঙ্গালা অধ্যাপনা বড়ই প্রশংসনীয় ছিল। স্বর্গীয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুকাল এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকটও গুরুদাস অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

এই সকল বিখ্যাত অধ্যাপকদের নিকট অধ্যয়ন করিয়া গুরুদাস এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন এবং উভয় পরীক্ষাতেই সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এক বছর পরেই তিনি এম-এ পরীক্ষা প্রদান করেন। গুরুদাস গণিতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় গুরুদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহার সহাধ্যায়ী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। ইনি পরবর্ত্তী কালে কাশ্মীরের রাজস্ব-সচিব হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই গুরুদাস প্রথম হইতেন, নীলাম্বর হইতেন দ্বিতীয়। এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর গুরুদাস আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই পরীক্ষায়ও যাহাতে নীলাম্বরকে পরাস্ত করিয়া প্রথম স্থান

অধিকার করেন এবং সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য গুরুদাস বিশেষ পরিশ্রম সহকারে রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন। গুরুদাসের মাতা পুত্রের এই মনোভাব সমর্থন করিলেন না। তিনি বলিলেন—"সহপাঠীকে পরাস্ত করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইবে, সেইজন্য আমি তোমাকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতে দিব না। যে সকল বস্তু উৎকৃষ্ট তাহা আমিই যেন পাই, অন্যে যেন পায় না এবম্প্রকার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করিতে পারি না। তুমি অনেক পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছ। এই পরীক্ষায় যদি নীলাম্বর ঐ পদক প্রাপ্ত হন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব।"

যাহা হোক্ ১৮৬৬ সালে আইন পরীক্ষায়ও গুরুদাস সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইলেন। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুদাস কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। গুরুদাস চিরদিন নিতান্ত সাদাসিদে ভাবে জীবন কাটাইয়াছেন। এই চাকুরীর জন্য গুরুদাস একদিন ডিরেক্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তখন শীতকাল। গায়ে তাঁহার একখানি লাল বনাত। ডিরেক্টার সাহেব তাঁহাকে একজন টোলের পণ্ডিত ভাবিয়া বলিলেন—"আমি আপনাকে কোন কার্য্য দিতে পারিব না, কোথাও পণ্ডিতের পদ খালি নাই।" গুরুদাস বলিলেন—"আমি পণ্ডিত-পদ-প্রার্থী নই, প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের

অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছি।” এই কথা শুনিয়া ডিরেক্টর সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপের পর তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাইলেন। তখনই গুরুদাসের নিয়োগ-পত্র দিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময় গুরুদাসের ছাত্রদের মধ্যে তিনটি পরবর্ত্তী কালে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজকর্ম্মচারী হইয়াছিলেন, এবং আনন্দরাম বরুয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পরম পণ্ডিত বলিয়া দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

গুরুদাস শিষ্টাচারী ও সংযমী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃদু অথচ কর্ত্তব্য-কঠোর ব্যবহার ছাত্রগণের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শিক্ষকতার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল। আইন পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি পাঁচ মাস কাল জেনারেল এসেম্ব্লিস্ বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরুদাস বহরমপুর কলেজে মাসিক তিনশত টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। অধ্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওকালতি করিবার অনুমতিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুদাসের মাতার ইচ্ছা ছিল না, গুরুদাস কলিকাতার বাইরে কোন চাকুরী গ্রহণ করেন। জননী পুত্রকে এই সর্ত্তে আবদ্ধ করিলেন যে মাসিক একশত টাকা আয় হইতে পারে এমন পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই গুরুদাসকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইবে।

বহরমপুরে গুরুদাস আইন ও গণিত অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার আইন অধ্যাপনা এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত যে, তাঁহাব দণ্ডবিধি বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সেখানকার বিভাগীয় কমিশনর মিঃ ক্যাম্বেল ও নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক রেভারেণ্ড মিঃ লং মাঝে মাঝে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন।

এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে গুরুদাস এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। 'অমর-কোষ' তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বহরমপুরে তিনি বিখ্যাত গ্রন্থকার রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বহরমপুরেই গুরুদাসের ওকালতিতে হাতে খড়ি। আবার এখানেই তিনি ধার্ম্মিক ও বিচক্ষণ আইনজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমের আইন-উপদেষ্টার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বহরমপুরে মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রধান উকীল ছিলেন। তিনি উদার ও সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে গুরুদাস ওকালতি ব্যবসায়ে লব্ধপ্রবেশ হন। মোকদ্দমায় মতিবাবু প্রবীণ ও গুরুদাস নবীন উকীল স্বরূপে কার্য্য করিতেন। একবার কোন মামলায় গুরুদাস এমন একটি আইন সঙ্গত নূতন যুক্তির অবতারণা করিলেন যে মতিবাবু সেই মামলায় গুরুদাসকেই প্রবীণ উকীলের পদ গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা দিতে বলিলেন। এরূপ উদারতা কমই দেখা যায়।

আইন ব্যবসায়ে গুরুদাস সাধুতা ও সততার চিরদিনই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। গুরুদাস যখন কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করেন, সেই সময়ে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা ফিসে একটি মোকদ্দমা গ্রহণ করেন। এই মামলার শুনানির পূর্ব্বদিন বহরমপুর হইতে দৈনিক দেড় সহস্র টাকা ফিসে একটি মোকদ্দমা গ্রহণের অনুরোধ আসে। কলিকাতার মামলাটি সাধারণ রকমের ছিল, উহার পরিচালনার ভার যে-কোন উকীলের উপর নির্ভর করিয়া থাওয়া যাইত, কিন্তু মক্কেল গুরুদাসকে ছাড়িল না। গুরুদাস বহরমপুরের মামলা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই।

গুরুদাস দেওয়ানী অপেক্ষা ফৌজদারী মামলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বহরমপুরে তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৭২ সালের শেষভাগে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার খ্যাতি কলিকাতায়ও অজ্ঞাত ছিল না। শীঘ্রই তিনি কলিকাতার একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞরূপে পরিচিত হইলেন। হাইকোর্টে ওকালতি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আইনশাস্ত্রের অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং 'দত্তকগ্রহণে ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা' ও 'বৃত্তিদানবিষয়ক হিন্দু আইন' এই দুই বিষয়ে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া "ডক্টর অব ল্য" উপাধি লাভ করিলেন।

১৮৮৮ সালে গুরুদাস হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকলিনের গুরুদাসের বিচক্ষণতা ও প্রখর বুদ্ধির উপর এমন আস্থা ছিল যে তিনি গুরুদাসকে সহযোগী অন্যতর বিচারপতি না করিয়া কোন মামলা বড় করেন নাই। গুরুদাসের বিচার-প্রণালী এমনই চমৎকার ছিল যে, যে মামলা করিত সে যেমন খুসী হইত, যাহার বিরুদ্ধে মামলা করিত সে-ও তেমনি খুসী হইত। গুরুদাস ষোল বৎসর হাইকোর্টের জজিয়তি করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সেই সময়ে উকীল-সমাজ তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন—

"বিচারপতিরূপে আপনি আইনের গভীর পাণ্ডিত্যে, দক্ষতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও অসামান্য সৌজন্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সকল আইন-ব্যবসায়ীর মনে আপনি এই ব্যবসায়ের গৌরব এমনভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে প্রচেষ্ট ছিলেন যে, সর্ব্বশ্রেণীর আইন-ব্যবসায়ী আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আপনি বিচারপতির গৌরবময় পদের কর্ত্তব্য এমনভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন যে, সকল আইনব্যবসায়ীর নিকট আপনার জীবন এক উজ্জ্বল আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে।"

গুরুদাসের এই স্বাধীন প্রকৃতি তাঁহার জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"আসানসোল রেলওয়ে ষ্টেশনে কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী এক হিন্দু বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। এই মামলার বিচারে গুরুদাসের সহযোগী বিচারপতি ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য বিশ্বাস করেন নাই, তিনি মনে করিলেন, ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে এই মামলা তৈয়ার করা হইয়াছে। গুরুদাস বুঝিলেন, আসামী যথার্থই অপরাধী, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য। তিনি স্বতন্ত্র রায় প্রদান করিয়া আসামীকে দণ্ড দিলেন। অতঃপর তিন জন বিচারপতি এই দুই রায় বিচার করেন, প্রধান বিচারপতি এই তিন জনের অন্যতম ছিলেন। এই বিচারে গুরুদাসের প্রদত্ত রায়ই বহাল রাখা হইয়াছিল।"

গুরুদাস কর্ত্তব্যে কোন দিনও বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই। তাঁহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বাঙালী খুবই কম দেখা গিয়াছে। ষোল বছর তিনি হাইকোর্টে বিচারপতি ছিলেন, এই সুদীর্ঘকালে তিনি অসুস্থতা ব্যতীত অপর কোন কারণে কদাচিৎ অনুপস্থিত হইয়াছেন।

পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর দিনও গুরুদাস নিয়মিত ভাবে হাইকোর্টে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাড়ীতে পুত্র বিসূচিকা রোগে কাতর—যখন-তখন মৃত্যু ঘটিতে পারে। আদালতে যাইয়া গুরুদাস ধীর ও শান্তভাবে যথানিয়মে বিচারকার্য্য সমাধা করিতেছিলেন। গুরুদাসের পুত্রের এই অসুখের সংবাদ পাইয়া

প্রধান বিচারপতি তখনই তাঁহাকে আদালতের কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ীতে যাইতে বলিলেন।

গুরুদাস যখন বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পুত্র মুমূর্ষু, কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ছেলেটি হেয়ার স্কুলে পড়িত। গুরুদাস তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ "যতীন্দ্রচন্দ্র পদক ও পুরস্কার" প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৮৭৯ সালে গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৯০ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন এবং তিন বৎসর যোগ্যতার সহিত এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করেন। গুরুদাসই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ভাইস্-চ্যান্সেলার। শিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তিনি বয়সে বৃদ্ধ হইলেও যুবকোচিত উৎসাহে সমস্ত কার্য্য করিতেন। তাঁহার মনের প্রফুল্লতা ও সজীবতা বার্দ্ধক্যের প্রভাবে নষ্ট হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের তিনি বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু প্রাচ্য আদর্শ ও রীতিনীতিকে তিনি চিরদিন শ্রদ্ধা ও সমাদর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহৎ ও উন্নত চরিত্র এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেবায় অক্লান্ত অধ্যবসায় তাঁহাকে সকলের স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার সমাদর তাঁহারই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

লর্ড কার্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধনের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি তাহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। উহার

অন্যান্য সভ্যদের সহিত গুরুদাস একমত না হওয়াতে তিনি তাঁহার মন্তব্য পৃথকভাবে লিখিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুদাস উহার অন্যতম উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গুরুদাস জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বলিতে তিনি কোন সঙ্কীর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি বুঝিতেন না—শিক্ষাক্ষেত্রে উদার সার্ব্বভৌমিক নীতিই তাঁহার আদর্শ ছিল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্-প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত যাদবপুর টেক্নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট আজও সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া দেশের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিতেছে। পরিষদের এই শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগের কথায় গুরুদাস বলিয়াছিলেন—

"শিল্প ও বিজ্ঞানের যে সকল শাখায় শিক্ষা পাইলে আমাদের দেশের ধনসম্পদ্ বর্দ্ধিত হইতে পারে, পরিষৎ সেই সকল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে প্রচেষ্ট হইবেন।

"টেক্নিকেল শিক্ষা ব্যতীত এই দেশের অন্ন-সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না। আমাদের কোন কোন বন্ধু এমন কথাও বলিতেছেন যে, আমাদের যতদূর শক্তি আছে, তাহার সমস্তই শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানে নিয়োজিত করা হউক। টেক্নিকেল শিক্ষাদানের ঐকান্তিক আবশ্যকতা বোধে আমি কাহারো কাছে পরাভব স্বীকার করি না। আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত তারক পালিত মহাশয়ের মহৎ দানে বেঙ্গল টেক্নিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট

প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু তাহা হইলেও আমি সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি উদার শিক্ষা উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহি। বাহ্য সম্পদের নিমিত্ত টেক্নিকেল শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, যথার্থ আনন্দের নিমিত্ত সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির শিক্ষার তেমনি প্রয়োজন।"

শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুদাস যাহা ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার 'এডুকেশন প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া' (Education Problem in India) এবং 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' নামক পুস্তকদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ বহির্বঙ্গে গুরুদাস শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ বলিয়াই সমধিক খ্যাত ছিলেন।

গুরুদাস নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। সামাজিক ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন এবং দেশাচারের অনুবর্ত্তন করিতেন। অল্প বয়সে বিবাহ তিনি সমর্থন করিতেন এবং বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। স্বীয় ধর্ম্মমতে পরম নিষ্ঠা তাঁহার ছিল বটে, কিন্তু তিনি অপর ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের কোনদিন দ্বেষ বা নিন্দা করেন নাই। তাঁহার ধার্ম্মিক চিত্তে এই প্রকার সঙ্কীর্ণতা স্থান পাইত না। গীতার তিনি ভক্ত ছিলেন। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে সকল কর্ম্ম করিতেন। গীতার এই মহাবাণী তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

১৯১৮ সালে ২রা ডিসেম্বর ৭৫ বৎসর বয়সে এই মনীষী দেশবাসীকে শোকার্ত্ত করিয়া পরলোক গমন করেন।



মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়

'[illegible] প্রতি [illegible] একবার [illegible] আমার দৃঢ় বিশ্বাস [illegible]" [illegible]।

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়

"রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদিগকে পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্র বাবু, পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিতে বড়ই ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন; এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল; কিন্তু ভূদেব তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড় চোপড় ছাড়িতে দেরি সহিল না। একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই তিনি একখান পুঁথি দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটী দেখ দেখি। আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে, "করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে এটী

টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা ত পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন। এই দেখুন তিনি স্বয়ং এই শ্লোকটি আমাকে পুঁথি মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র বাবু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "ও কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল। তা তোমার বাবা বল্‌বেন বই কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" রামচন্দ্র বাবু ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাশের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কালো হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী। শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটী বড় বড় ও অতিশয় উজ্জ্বল। দেখিলে অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটীর পর একেবারে আমার নিকট আসিয়া সেকহ্যাণ্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তোমার নাম কি? কোথায় ঘর তোমার? ইত্যাদি।" আমি তাহার এই অতি মিষ্ট সম্ভাষণ ও সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিলাম। ইনিই মধু, এই দিন হইতে ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল।"

যিনি নিজের বাল্য কাহিনী এমন সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন,

তিনিই প্রাতঃস্মরণীয় মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বাংলাদেশে যাঁহারা শিক্ষাবিস্তারে জীবনের সমস্ত সময় ও সঞ্চয় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, ভূদেব তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন।

১৮২৫ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত নতিবপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

ভূদেব বাল্যকালে পিতার নিকট কিছু বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া নয় বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এখানে বছর দুই পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে উলাষ্টন সাহেব সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন। একদিন তিনি ভূদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূদেব, তুমি কি ইংরেজী পড়িবে ?" সাহেবের উৎসাহে ভূদেব ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। সাহেব তাঁহার পুঁথি পত্র, কাগজ কলম সব কিছু নিজেই দিতেন। একবছর এইরূপ পড়া চলিল। বাড়ীর কেহ এই কথা জানিতে পারিল না।

এদিকে ভূদেব ইংরেজীতে যতই উন্নতি করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার উপর ততই তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত রামচরণ শিরোমণি, তাঁহাদের বাড়ীতে আসিলেন। তিনি ভূদেবকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ভূদেব সংস্কৃত ব্যাকরণে বড়ই কাঁচা রহিয়াছেন। তিনি ভূদেবের পিতাকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তর্কভূষণ, ছেলেটি যে রাখাল হইল।" ইহাতে বিশ্বনাথ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং ছেলেকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। পরদিন যখন ভূদেবকে পিতা চণ্ডীমণ্ডপে পড়িতে বসাইলেন, তখন ভূদেব সত্যই বাঁকিয়া বসিল, "আমি আর সংস্কৃত পড়িব না। যে শাস্ত্র পড়িলে লোকে এত নিষ্ঠুর হয়, আমি তাহা পড়িব না।" একগুঁয়ে ভূদেব শীঘ্রই রাজা রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান একাডেমীতে ইংরাজী শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুকাল এই স্কুলে পড়িবার পর এক শিক্ষকের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা হওয়ায় ভূদেব উক্ত বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিলেন এবং নবীন মাধব দের নব্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ে ভূদেব ভাল ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ভূদেবের একটি আত্মীয় ছেলে তাঁহার সঙ্গে পড়িত। সে ভারী দুষ্ট ছিল। ভূদেবের বাসায় থাকিয়াই সে পড়াশুনা করিতেছিল। পরীক্ষায় ভূদেব প্রথম পুরস্কার পাইল, ছেলেটি কিছুই পাইল না। বাড়ী গেলে তাহার আর নিস্তার নাই,—হয়ত তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে। এই সকল কথা কহিয়া ছেলেটি ভূদেবকে বলিল,—"তুমি বাড়ীর ছেলে, তুমি পুরস্কার না পাইলে তোমাকে কে কি করিবে? কিন্তু আমার আর রক্ষা নাই, তুমি পুরস্কারের পুস্তকগুলি আমাকে দিয়া আমাকে বাঁচাও।" ভূদেব তখনই নিজের বইগুলি ছেলেটিকে দিয়া দিলেন। প্রশংসা ও যশ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর আরো দুই একটি স্কুল বদলাইয়া ভূদেব অবশেষে ১৮৩৯ সালে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার ছাত্রজীবনের স্মৃতি-কথা ও অমর কবি মাইকেল মধুসূদনের সহিত পরিচয়-সূত্র প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে আমরণ পরম বন্ধুত্ব ছিল।

ভূদেবের মাতা পরমা সুন্দরী ব্রহ্মময়ী দেবীকে মধুসূদন বড়ই ভক্তি করিতেন এবং "রাজলক্ষ্মীর জীবন্ত ছবি" মনে করিতেন।

হিন্দু কলেজে ভূদেবকে অনেক কষ্ট করিয়া পড়িতে হইতে। দরিদ্র অধ্যাপক বিশ্বনাথের পক্ষে হিন্দু কলেজের শিক্ষার গুরুভার বহন করা সম্ভবপর ছিল না। অপরের পুঁথি বা লাইব্রেরী হইতে ধার-করা পুঁথির সাহায্যে তাঁহাকে পড়াশুনা করিতে হইত। কলেজে ভূদেব একজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। কলেজের অধ্যাপক ও সহাধ্যায়ী সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। একবার ভূদেবের কলেজের বেতন আশি টাকা বাকী পড়ে। ফলে তাঁহার পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। বন্ধু-বৎসল মধুসূদন তাঁহাকে এই টাকা সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভূদেব এই সময়ে বৃত্তি পাওয়াতে মধুসূদনের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয় নাই।

এই সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা দেশের যুবকদিগকে উচ্ছৃঙ্খল ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের মুখেও ভূদেব স্বীয় ধর্ম্মে ও আচারে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। পরণে মোটা লালপেড়ে দেশী ধুতি, গায়ে

সাদা চাদর ও পায়ে চটী জুতা, ইহাই তাঁহার সাধারণ পোষাক ছিল। ভূদেব একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছিলেন এবং লোকের সঙ্গে মেশামেশি কম করিতেন।

১৮৪৫ সালে হিন্দুকলেজের পাঠ সমাপন করিয়া পরবৎসর ভূদেব সার্টিফিকেট পাইলেন। এই সময়ে মিশনরীদের প্রভাব হইতে হিন্দু ছেলেদিগকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু নেতৃবর্গের উদ্যোগে হিন্দু চেরিটেব্‌ল ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভূদেব উহার প্রধান শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আরো কতকগুলি স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া পরিশেষে ৫০৲ টাকা বেতনে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন এই কার্য্য করিবার পর ১৮৪৯ সালে ১৫০৲ টাকা বেতনে হাবড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন। ১৮৪৬ সালে ভূদেব নবপ্রতিষ্ঠিত হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে ভূদেব চুঁচূড়ায় নিজবাটী তৈরী করিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহার পর তিনি যথাক্রমে স্কুল সমূহের সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টার ও ইন্‌স্‌পেক্টার পদে নিযুক্ত হন। পরিশেষে মাসিক দেড় সহস্র টাকা বেতনে শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার পদও লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ সালে ভূদেব শিক্ষাদর্পণ নামে দুই আনা মূল্যের মাসিকপত্র প্রচার করেন। উহা পাঁচ বছর চলিয়াছিল।

অতঃপর এডুকেশন গেজেট নামে অপর একখানি পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাখানি পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ভূদেব আমরণ উহা সুখ্যাতির সহিত পরিচালনা করেন।

১৮৭৭ সালে ভূদেব সরকার হইতে সি-আই ই উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং ১৮৮২ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হন। ঐ সালেই তিনি শিক্ষাকমিশনের সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ভূদেব শুধু শিক্ষা-বিস্তারেই ব্রতী ছিলেন না, সাহিত্য প্রচারেও অগ্রণী হইয়াছিলেন। পত্রিকা প্রচার ব্যতীত তিনি অনেক সৎগ্রন্থ লিখিয়া বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাশীল রচনার মধ্যে শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি বিশেষ খ্যাত। এতদ্ব্যতীত তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ভূদেব যেমন জ্ঞানবিতরণে একদিকে জাতিকে সমৃদ্ধ করিতেছিলেন, অপরদিকে আবার নিজের জীবনকে জ্ঞান ঋদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার তীব্র পিপাসা ছিল। শেষ বয়সে তিনি কাশীতে অনেকদিন সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়াছিলেন।

সুশৃঙ্খল কর্ম্মকুশলতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা ভূদেবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাই তিনি লিখিতে পারিয়াছেন, "ইংরেজের কাছে আমাদের কর্ম্মকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছু শিখিতে হয় না, প্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল।"

ভূদেবের আর এক অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহার অসামান্য বদান্যতা। তাঁহার সারা জীবনের সঞ্চিত প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে পিতার নামে "বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ড" নামক এক ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া উহার উপর এই অর্থের ব্যয়ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। একজন চাকুরীজীবীর পক্ষে এরূপ রাজোচিত দান এদেশে দুর্লভ। মনস্বিতা ও হৃদয়বত্তার এরূপ মিলন বিরল। সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য ভূদেব পিতার নামে 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং মাতার নামে 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' নামে দেশীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দুঃস্থ ও পীড়িতের সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৪ সালে ১৬ই মে এই মহামনস্বী পরলোক গমন করেন।



ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ

১৮৪৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ নামক এক নিভৃত পল্লীতে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে পঞ্জাবে ইংরেজে ও শিখে তুমুল লড়াই চলিতেছে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ঘোষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। রাসবিহারীর বাল্যশিক্ষা গ্রাম্যপাঠশালায় আরম্ভ হয়। তৎপর তিনি বর্দ্ধমান রাজ কলেজ-স্কুলে কিছুকাল পড়েন। অবশেষে বাঁকুড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে যাইয়া ভর্ত্তি হন। এই স্কুল হইতেই তিনি ১৮৬০ সালে পনর বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং এগার টাকা বৃত্তি পান।

পর বৎসর রাসবিহারী কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হইলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফল খারাপ হওয়ায় রাসবিহারী সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়াই হোক্ এবার ফল ভাল করিবেনই। দৃঢ়ব্রত রাসবিহারীর সাধু সঙ্কল্প সফল হইল। ১৮৬২ সালে এফ্-এ পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। পর বৎসর তিনি কৃতিত্বের সহিত বি-এ পরীক্ষা এবং তৎপর বৎসর এম্ এ অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাইয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

১৮৬৭ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া

উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ছাত্রজীবনে তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। শুধু পাঠ্য পুস্তকেই তাঁহার পড়াশুনা আবদ্ধ ছিল না। পরবর্ত্তী কালে তিনি যে ভাবোচ্ছ্বাসময় রচনা লিখিয়াছেন, তাঁহার জন্য এই সময়েই তিনি সকল উপকরণ জীবনে সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকারদের রচনা-ধারা তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। রাসবিহারীর ইংরেজী লেখা সম্বন্ধে শত বর্ষ যাবত পরিচালিত একখানা প্রসিদ্ধ ইংরেজ পত্রিকা যথার্থই লিখিয়াছিলেন—"ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতাসমূহ—তা সে কাউন্সিল গৃহেই প্রদত্ত হোক্ বা কংগ্রেসের মঞ্চ হইতেই উচ্চারিত হোক্—সর্ব্বদাই সর্ব্বোত্তম ও অনুপম ভাষায় বিবৃত হইত। উহা শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকদের রচনার সঙ্গে একাসনে ঠাঁই পাইবার যোগ্য। তাঁহার যুগান্তর-কারী গ্রন্থ "Law of Mortgage in British India" ভাষার দিক্ দিয়া শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকদের ভাষার সঙ্গে উপমিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

১৮৬৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ২২ বছর বয়সের সময় রাসবিহারী কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। এই অল্পবয়স্ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যবহারজীব শীঘ্রই তৎকালীন বিচারপতি স্বনামপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর অত্যন্ত সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যদিয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত স্বগৃহে আইনের আলোচনা ও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার

ফলে ১৮৭১সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পরীক্ষায় অনার্স পাশ করেন এবং ১৮৭৫-৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর আইন-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি সুবিখ্যাত Law of Mortgage সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৭৬ সালে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই বছর হইতেই তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। ইহার পর বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতিপত্তির সহিত হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া গিয়াছেন। অর্থ ও যশ তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে। রাসবিহারী শুধু বিচক্ষণ ব্যবহারজীব ছিলেন না, বিখ্যাত শিক্ষা বিদ্‌ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগের সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৪ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এল্‌ উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৮ সাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ২৫০০৲ টাকা দান করেন। এই টাকা হইতে তাঁহার মাতা পদ্মাবতী দেবীর নামে প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ মহিলা গ্রাজুয়েটকে পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তিনি বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার প্রতিও বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। স্বদেশীযুগে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তিনি একজন পরম উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের তিনি সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রূপে লর্ড কার্জ্জন একবার অনেক কটূক্তি

করিয়াছিলেন। রাসবিহারী সে সময়ে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

১৮৮৮ সালে রাসবিহারী সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন এবং পুনরায় ১৮৯০ সালে পুনর্নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯১ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের (সুপ্রীম লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে) সভ্য নিযুক্ত হন। এই সময়ে সহবাস-সম্মতি আইন লইয়া দেশে আন্দোলন চলিতেছিল। রাসবিহারী গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাসবিহারীর সুযুক্তি-পূর্ণ বজ্র-গম্ভীর বক্তৃতা ভীতি ও আনন্দের বস্তু ছিল। বাটোয়ারা আইন, শুল্ক আইন প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। অনেক গুরুতর বিষয়ে এবং বিশেষ বিশেষ কমিটিতে রাসবিহারীর উপস্থিতি না হইলে চলিত না। গভর্ণমেণ্টও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার মর্য্যাদা দিতে বাধ্য হইতেন। সরকারের নিকট হইতে রাসবিহারী যথাক্রমে সি-আই-ই ও সি-এস্‌-আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাসবিহারীর দুইটি বক্তৃতা বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। একটি ১৯০৭ সালের রাজদ্রোহমূলক সভাসমিতি নিবারক আইনের বিরুদ্ধে এবং অপরটি ঐ সালেরই অর্থ-নৈতিক (আয়-ব্যয় বিষয়ক) আলোচনা সম্বন্ধে।

১৮৯৬ সাল থেকেই আমরা ডাঃ রাসবিহারীকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে দেখিতে পাই। ঐ সালে তিনি

কলিকাতা কংগ্রেসে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে কলিকাতা টাউন হলের সভায় সভাপতিরূপে তিনি লর্ড কার্জ্জনের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ স্মরণীয়। স্বদেশী-বাদের অর্থনৈতিক দিকটা তাঁহার বক্তৃতায় চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে : তিনি লিখিয়াছিলেন—

"Swadeshism, I need not remind you, is not a new cult. It counted among its votaries all thoughtful men long before the division of Bengal, and found expression in the Industrial & Agricultural Exhibition held under the auspices of the National Congress in Calcutta in 1901. The Swadeshi movement has been the principal motive power in the industrial development of the country."

১৯০৮ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে রাসবিহারী সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার সে বক্তৃতা ভাবে ও ভাষায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রাসবিহারীর ব্যক্তিগত জীবন সরল ও আড়ম্বরশূন্য। তিনি দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই পত্নীই মারা যান। শেষ বয়সে তিনি দীর্ঘ কাল বিপত্নীক ছিলেন। এই নিঃসন্তান

কৃতী মনীষীর গৃহ আত্মীয়-স্বজনের কলকোলাহলে মুখরিত থাকিত। অমন খোলা-প্রাণ ভোলা-মন মানুষ দেখা যায় কম। তাঁহার উদার হৃদয়ের নিকট কেহ কোন-কিছু যাচ্ঞা করিয়া বিমুখ হয় নাই। আজ কংগ্রেসের চাঁদা, কাল সাহিত্য-পরিষদের চাঁদা, পরশু বিপন্নের সাহায্য ইহা তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। রাসবিহারী যেমন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তেমনি তাহার সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। এই দানবীরের বৃহত্তম দান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজের জন্য প্রথম দশ লক্ষ টাকা ও পরে এগার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা দান। রাসবিহারীর এই রাজোচিত দান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজ প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছে। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুলের জন্য তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার সাতের লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দানেও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। রাসবিহারীর জীবনের অন্যতম সখ ছিল বই পড়া। আমরণ তাঁহার এই অধ্যয়ন-তপস্যা সমভাবে চলিয়াছে। গভীর রাত্রি জাগিয়া তিনি পড়িতেন। সেইজন্য ভোরে উঠিতে তাঁহার বেলা নটা বাজিয়া যাইত।

রাসবিহারী একদিকে যেমন গভীর অধ্যয়ন করিতেন, সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ব্যতীত তিনি য়ুরোপের ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহ বেড়াইয়াছিলেন।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডাঃ রাসবিহারী পরলোক গমন করেন।

রাসবিহারীর মত বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গভীর পাণ্ডিত্যশালী আইনজীবী এদেশে খুবই কম দেখা গিয়াছে। দেশের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত বিকাশ সাধনে সহায়ক হয় নাই, কোন স্বাধীন দেশে জন্মিলে রাসবিহারী স্বীয় প্রতিভা বলে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের অদ্বিতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে একজন মনস্বী লিখিয়াছিলেন—

"যে জননায়ক জনসাধারণের ধাত এবং ইতিহাসে উপেক্ষা করিয়া নব রাষ্ট্র গড়িতে যাইবেন, তিনি কাগজে কলমে অভিনব ইউটোপিয়ার চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে স্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এ দেশের লোক যখন এ কথা বুঝিতে পারিবেন, তখন তাহারা বুঝিতে পারিবেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় লোক ছিলেন এবং দেশের জন্য তিনি কত কাজ করিয়া গিয়াছেন।"

সত্যই যাঁহারা এই আত্মবিস্মৃত জাতিকে তাহার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জাতিকে বরণীয় করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন, তাঁহারা মহাপুরুষ মহামনীষী। তাই রাখালদাস আজ সমগ্র জাতির পূজ্য।

রাখালদাস বড় লোকের ছেলে ছিলেন—পিতামাতার আদরের ধন। বাল্যে ও কৈশোরে তাঁহার কোন অভাব ছিল না। মুখের কথাটি না ফুটিতে তাঁহার সকল প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিষ আসিয়া হাজির হইত। কিন্তু রাখালদাস ধনী ছিলেন বলিয়া গর্ব্বিত ছিলেন না। তাঁহার উদার হৃদয় সহপাঠীদের দুঃখে করুণায় বিগলিত হইত। ছাত্র-জীবনে কত

যে সহাধ্যায়ী তাঁহার সাহায্য ও সহায়তা পাইয়া উপকৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

যখন বাল্যকালে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন, সেই সময়েই রাখালদাসের ইতিহাস পড়ায় খুব অনুরাগ দেখা যাইত। বাল্যকালেই তিনি পিতার সহিত উত্তর ভারতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে পরিদৃষ্ট ঐতিহাসিক দৃশ্য-সংস্পৃষ্ট ঘটনা ও চরিত্রগুলি যেন তাঁহার মনে এক গভীর দাগ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।

তারপর যখন রাখালদাস কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, তখনই তিনি যথার্থ প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। রাখালদাস নিজেই বলিয়াছেন যে "কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট সংস্কৃত পড়িতেন, তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশের ফলে তাঁহার মনে পুরাতত্ত্ব অনুশীলনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল।" "বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পুরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য রাখালদাস ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পুরাবিদ্যা-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার থিওডোর ব্লকের শরণাগত হইয়াছিলেন। থিওডোর ব্লক যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাখালদাস সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। রাখালদাস বরাবরই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে যাহা-কিছু শিক্ষা করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং থিওডোর ব্লকের নিকট

ঋণী। ১৯০৫ সালে অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার যখন ব্লকের স্থানে কিছু দিনের জন্য মিউজিয়মের কাজ করিতে আসিয়া ছিলেন, তখন তিনি রাখালদাসের সংগৃহীত ফটোগ্রাফাদি উপকরণ পরীক্ষা করিয়া এবং পুরাবি গর্জ্জনের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই রাখালদাস শক-কুষাণ যুগের ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

রাখালদাস যখন বি-এ পড়িতেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই মারা যান। পিতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি এক বৎসর কাল কলার পাতায় ভোজন ও মাটীর পাত্রে জল খাইতেন।

রাখালদাসের বন্ধুপ্রীতি সম্বন্ধে দুই একটি গল্প বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একবার তাঁহার কোন পিতৃহীন সমপাঠীর পরীক্ষার ফিস্ যোগার হইল না। রাখালদাস তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন—"টাকা না যোগাড় হয় আমি যে প্রকারে পারি অভাব পূরণ করিয়া দিব।" আর একবার তাঁহার এক সহপাঠীর ঘর পুড়িয়া গেল, বেচারার সমস্ত পুঁথি-পত্র নষ্ট হইয়া গেল, সামর্থ্যও এমন নাই যে আবার কিনিয়া লয়। রাখালদাস তাহাকে নিজের বই দিয়া সাহায্য করিলেন, টাকা দিয়া সাহায্য করিলেন।

রাখালদাসের হাতের লেখা ভাল ছিল না। এজন্য তাঁহাকে লিপিকারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত।

রাখালদাস আমরণ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিয়া গিয়াছেন এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী বহু গ্রন্থ লিখিয়া তিনি এ দেশের ঐতিহাসিক সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাখাল-দাসের বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ও ২য় ভাগ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া ইতিহাস আলোচনা রাখালদাস করিয়া গিয়াছেন। রাখালদাসের অন্যতম কীর্ত্তি ইংরেজীতে লিখিত তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস এবং প্রাচ্য ভারতের মধ্য যুগের ভাস্কর্য্যের বিবরণ। উড়িষ্যার ইতিহাস কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় উহার মুদ্রণ কার্য্য গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় শেষ হয় নাই।

ইতিহাস সম্বন্ধে লোকের ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইলে গল্পচ্ছলে প্রাঞ্জল ভাষায় উহার প্রচার আবশ্যক। রাখালদাস এ কথা ভাল করিয়া বুঝিতেন। তাই তিনি এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপাল, ময়ূখ, অসীম, করুণা প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

"রাখালদাসের প্রধান কীর্ত্তি, রাখালদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি—মহেন-জো দড়োতে অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কার। রাখালদাসের মহেন-জো-দড়োতে ভগ্ন স্তূপ খননের পূর্ব্বেই হরপ্পায় এই শ্রেণীর পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল বস্তু যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন তাহা রাখালদাসই প্রথম অনুমান করিতে সমর্থ হইয়া-

ছিলেন এবং তিনিই তৎপ্রতি পুরাতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাখালদাসের আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝিতে হইলে উহার প্রাচীনতা বিবেচ্য। এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে বৈদিক সাহিত্য ছাড়া অবিসম্বাদিত রূপে মৌর্য্য যুগের পূর্ব্ব কালের উন্নত সভ্যতার কোন নিদর্শন আমাদের হস্তগত ছিল না। এই আবিষ্কার হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০০ অব্দ হইতে এক ধাক্কায় খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০০০ অব্দে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। হরপ্পায় এবং মহেন-জো-দড়োর ভগ্নাবশেষ যে অতি প্রাচীন তাহার এক প্রমাণ এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে লোহার চিহ্নও পাওয়া যায় নাই; কেবল ফ্লিণ্ট পাথরের ছুরি এবং তামার তৈয়ারী অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে যুগের মানুষ লোহার অস্তিত্ব অবগত ছিল না, লোহার অভাবে তামার অস্ত্র ব্যবহার করিত, এবং যে যুগে, তামা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই, হরপ্পায় এবং মহেন-জো-দড়োর ভগ্নস্তূপ সেই অতি প্রাচীন পাষাণ যুগের এবং তাম্র যুগের সন্ধিক্ষণের সভ্যতার পরিচায়ক। খৃষ্টাব্দের হিসাবে এই সভ্যতার বয়ঃক্রম কত তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হরপ্পায় এবং মহেন-জো-দড়োতে অপরিচিত অক্ষরের লেখাযুক্ত বহু সংখ্যক সচিত্র মোহর (Seal) পাওয়া গিয়াছে।

"অনেক দিন পূর্ব্বে ঠিক এই প্রকার একটী মোহর পারস্যের অন্তর্গত সুসার ভগ্নাবশেষের মাটীতে পাওয়া গিয়াছিল এবং আর



রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

একটী মোহর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত কিশের ভগ্নাবশেষ খনন কালে পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটী মোহর যে সুসার এবং কিশে তৈয়ারী হয় নাই, কিন্তু হরপ্পা-মহেন-জো-দড়ো অঞ্চল হইতে তথায় নীত হইয়াছিল, এই প্রকার সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। সুসার এবং কিশের ভগ্নস্তূপের যে স্তরে এই সিন্ধুদেশীয় মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছিল; নানা প্রমাণের বলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ সেই স্তরের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০ অব্দ। সিলমোহর ছাড়া অন্যান্য বস্তুও মেসোপোটেমিয়ার ভগ্নস্তূপ নিচয়ের ঐ একই স্তরে পাওয়া গিয়াছে যাহা খুব সম্ভব সিন্ধুদেশ হইতে সেখানে আমদানী করা হইয়াছিল। ঋক্‌বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির রচনার কাল লইয়া পণ্ডিত সমাজে বিস্তর মতভেদ থাকিলেও, মহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পা নগরী, যে খৃষ্টাব্দের আরম্ভের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এই বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই। সেই সময় এই নগরীদ্বয়ের সভ্যতা নিকটবর্ত্তী দেশের সভ্যতার তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং এ সভ্যতাকে ধার-করা সভ্যতা অথবা আগন্তুকগণের আনীত সভ্যতা বলা যায় না; এই সভ্যতা সিন্ধুনদের তীরেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা যেমন প্রাচীন তেমনই উন্নত ছিল, একথাও সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সমুন্নত সভ্যতা যখন আমদানী করা নয়, দেশজ,—তখন স্বীকার করিতে হইবে, আনুমানিক ছয় সাত

হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুতীরে সভ্যতার সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে যে সুমেরীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা দেশজ নহে, আগন্তুকগণের আনীত। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সুমেরীয় সভ্যতা কি সিন্ধুদেশ হইতে গত ঔপনিবেশিকগণের সৃষ্টি? প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুদেশের সভ্যতা এবং সুমেরীয় সভ্যতায় কোনো কোনো বিষয়ে এত প্রভেদ আছে যে, পণ্ডিতেরা এই দুই সভ্যতার মধ্যে এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা আপাতত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তের বাহিরে, অথচ ভারতবর্ষেরই নিকটে হয়ত বেলুচিস্থান অথবা সিস্তানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যাহা মূল, তাহা রোপিত হইয়াছিল। সেই মূল হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার এক কাণ্ড সিন্ধুনদের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং আর এক কাণ্ড টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ নদের তীরদেশে পৌঁছিয়াছিল।

"সিন্ধু তীরের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার উৎপত্তি অপেক্ষা পরিণতির প্রসঙ্গ আমাদের কাছে অধিকতর শিক্ষাপ্রদ। সুমেরীয় সভ্যতার মূল ধারা এবং মিশরীয় সভ্যতার মূল ধারা বহুকাল শুকাইয়া গিয়াছে। সিন্ধুতীরের সভ্যতার মূলধারাও কি সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছে? না, হিন্দু সভ্যতার আকার ধারণ করিয়া আজও প্রবহমান আছে? সিন্ধুতীরের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা, বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যতার অন্তরালে এখনও জীবিত

রহিয়াছে, অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতা মূলতঃ সিন্ধুতীরের প্রাচীন সভ্যতা। রাখালদাসের আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিক চিন্তাস্রোত এখন কোন্ খাতে চলিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য একথাটা একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক মনে করি। রাখালদাসের পরে যাঁহারা মহেন-জো-দড়ো খনন করিয়াছেন তাঁহারা কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি পাইয়াছেন, যে সকল মূর্ত্তির অঙ্গভঙ্গী এবং মুখভঙ্গী হুবহু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধ্যানযোগীর মুখভঙ্গীর মত। মহেন-জো-দড়োর এই সকল মূর্ত্তির হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে সকল মূর্ত্তি অবশিষ্ট আছে তাহাতে 'সমংকায় শিরোগ্রীবং' এবং নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি পরিষ্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। মহেন-জো-দড়োতে প্রাপ্ত কোনো কোনো মোহরে যোগীর মত পদ্মাসনবদ্ধপদে উপবিষ্ট মনুষ্যের চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও এরূপ মূর্ত্তি বা চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষের কত দেব দেবীর এবং বুদ্ধ বা জিনের মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে তাহার সকলগুলিই নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি। ইহার কারণ হিন্দুর উপাসনাকাণ্ড এক হিসাবে যোগীর পূজা। বুদ্ধ এবং জিনগণ ধ্যানস্থ বা যোগযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবের বিষ্ণু ও শৈবের শিবও যোগীর আকারে কল্পিত। তাই বুদ্ধ ও জিন মূর্ত্তির ন্যায় হিন্দুর ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিও নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি। যে ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্ত্তির সহিত মহেন-জো-দড়োর মূর্ত্তির এমন ঐক্য দেখা যায়, সেই

ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর মূর্ত্তির মধ্যে যে একটা নিকট সম্পন্ন আছে, একথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহেন-জো-দড়োর অধিবাসিগণের মধ্যে কোনো এক প্রকার যোগসাধন এবং এবং যোগস্থ দেবতার বা সাধুর উপাসনা প্রচলিত ছিল, যাহা কালক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের প্রাণবস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

"রাখালদাসের মহান্ আবিষ্কার যে মানবের ইতিহাস এবং সমাজ-বিজ্ঞানকে উন্নতির পথে কতদূর লইয়া যাইবে তাহা এখন অনুমান করা দুঃসাধ্য। ভবিষ্যতে এই সকল বিদ্যার যতই অনুশীলন হইবে, রাখালদাসের স্মৃতির প্রতি পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধা ততই বাড়িতে থাকিবে। রাখালদাসকে আর আমরা সশরীরে দেখিতে পাইব না বটে, রাখালদাসের মৃত্যু নাই, রাখালদাস অমর।"

১৩৩৭ সালে রাখালদাস ইহলোক ত্যাগ করেন।



অধ্যাপক যদুনাথ সরকার

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ১৩৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সেলারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙালী অধ্যাপকের ভাগ্যে এই উচ্চ সম্মান লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জেলার করচমারিয়া গ্রামে যদুনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺রাজকুমার সরকার তখন উত্তর বঙ্গের একজন উচ্চশিক্ষিত দেশসেবক জমিদার বলিয়া সুপরিচিত।

যদুনাথ যথাক্রমে রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করিয়া, ১৮৯২ সালে তিনি ইংরেজীতে এম্‌-এ পরীক্ষা দেন। এম্‌ এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কলেজ সহপাঠীদের মধ্যে মহীশূর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার আল্‌বিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। ১৮৯৭ সালে যদুনাথ ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এই চারি বিষয়ের পরীক্ষা দিয়া, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিস্বরূপ সাত হাজার টাকা ও মোয়াট স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থ "আওরংজীবের সমসাময়িক ভারতবর্ষ"—এই রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য লিখিত হয়।

ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি মৌলিক গবেষণার জন্য গ্রীফিথস্ প্রাইজ লাভ করেন।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে তিনি বিদ্যাসাগর (পূর্ব্বে মেট্রোপলিট্যান নাম ছিল) কলেজের অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হন। ১৮৯৮ জুন মাসে তিনি অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ উইলসন সাহেব পর বৎসর তথায় ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার উন্নতি সাধনের জন্য যদুনাথকে সেখানে বদ্‌লী করান। সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর পাটনায় অতিবাহিত করিবার পর, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি দুই বৎসরের জন্য ভারতেতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে কাশী গমন করেন। ১৯০৮ সালে ইশলিংটন কমিটির নির্দ্দেশে তিনি এবং আরও কয়েকজন ভারতীয় কর্ম্মচারী প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগ হইতে (I. E. S.) ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে উন্নীত হন। ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি তাঁহাকে আবার তাঁহার স্থায়ী সরকারী কার্য্যে আনয়ন করা হয়। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া, কটক রাভেন্‌শা কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি পুনরায় পাটনা কলেজে ফিরিয়া আসেন, অবসর গ্রহণের শেষ দিন (৭ই আগষ্ট ১৯২৬) পর্য্যন্ত পাটনায় অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত বহুদিন হইতেই

যদুনাথের সংযোগ ছিল। ক্রমান্বয়ে নয় বৎসর তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট, বোর্ডগুলির এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট ও নানা কমিটির সদস্য ছিলেন। আট বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট অধ্যাপকরূপে তিনি পাটনা কেন্দ্রে এম্-এ ইতিহাসের শিক্ষকতা করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টরীক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের স্থাপনা (১৯১৯) হইতেই তিনি ইহার বিশেষজ্ঞ সদস্য নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া প্রায় প্রতি পূজার ছুটিতেই তিনি ভারতের নানা ঐতিহাসিক প্রদেশ ও নগর ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলেই স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর আগ্রহে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুবিখ্যাত গ্রেটব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী তাঁহাকে "সম্মানিত" সদস্য নির্ব্বাচিত করেন (১৯২৩); এই পদ সমস্ত সভ্য জগৎ হইতে বাছিয়া কেবল মাত্র ৩০ জন লেখককে দেওয়া হয়। ১৯২৬ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্ত্তমান বর্ষে বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে 'জেম্স ক্যাম্বল্ স্বর্ণপদক' ও একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহা তিন বৎসর পরে পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখককে দেওয়া হয়। তিনি বাঁকিপুর অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং ১৯১০ সালে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন।

গ্রন্থকার হিসাবে অধ্যাপক সরকারের নাম দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত ইংরেজী গ্রন্থগুলি—আওরংজীব, শিবাজী প্রভৃতি সুধী সমাজে উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার লিখিত অনেক গবেষণামূলক ইংরেজী প্রবন্ধ মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বিরাট পুস্তকাগারে বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টায় বহু কষ্টেগৃহীত ফার্সী, মারাঠি ও পর্তুগীজ প্রাচীন পুঁথী, মুদ্রিত পুস্তক ও দলিল-দস্তাবেজ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া বহু ঐতিহাসিক ছাত্র নিজেদের গবেষণার বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক সরকারের মত গুরু লাভ করিয়া যাঁহারা মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের তথা বাঙ্গলার মধ্যযুগের ইতিহাসের নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাহা বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের জন্য যদুবাবু কতবার উপহার দিয়াছেন, একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

